তিনজন আধুনিক কবি

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

তিনজন আধুনিক কবি

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

পূর্বাশা

প্রথম সংস্করণ

বৈশাখ, ১৩৫১

আট আনা

পূর্ব্বাশা লিঃ পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিন্যু, কলিকাতা
হইতে সত্যপ্রসন্ন দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভূমিকা

এখন যারা কবিতা লিখছেন তাঁদের মধ্য থেকে মাত্র তিন জন কবির কাব্য রূপ সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা এখানে করা হ'ল। এ থেকে কেউ যেন না মনে করেন যে এই তিন জনের কবিতা ছাড়া আর কারো কবিতা রবীন্দ্রোত্তর যুগে উল্লেখযোগ্য নয় বা তিনজনের কবিতা সম্বন্ধে বলবার আর কিছু বাকি রইল না। এঁরা ছাড়াও অনেক কবি ভালো কবিতা লিখেছেন, ভঙ্গীর স্বকীয়তায় বা বিষয়ের নূতনত্বে অনেক কবিই রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার সমৃদ্ধি সাধন করেছেন; তাঁদের কথা এ-বইয়ে বলা হয়নি। কেন বলা হয়নি তার কৈফিয়ৎ দেওয়ার চেয়ে, এ তিনজনের কবিতার আলোচনা কেন করা হল তার কারণ বলাই বরং সহজ।

রবীন্দ্রোত্তর যুগ বলতে যে সময়টাকে প্রথম চিহ্নিত করা হয় তা রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরেকার এই দু'তিন বছর নয়, ওটা 'কল্লোল'-'কালিকলম'-'প্রগতি'র যুগ। এই তিনটি সাময়িক পত্রিকার মারফৎই বাঙালী পাঠক-সমাজ প্রথম জানতে পেরেছিল যে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যাদর্শ ছাড়াও সাহিত্যের অন্য আদর্শ আছে। সেই অন্য আদর্শ নিয়ে সে-যুগে অনেক নূতন কবির আবির্ভাব হয়, জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু তাঁদের অন্যতম। এই তিনজন কবি সে-যুগ থেকে সুরু করে আজ পর্য্যন্ত কবিতা লিখে চলেছেন। দীর্ঘ দিনের কাব্য সাধনায় তাঁদের সৃষ্টির গায়ে নূতনতর জলবায়ুর স্পর্শ ত লেগেছেই তাছাড়া

তাঁদের কবিতার প্রভাবে সাম্প্রতিক কবিতার ভঙ্গী, ধরণ ও মনোভাব খানিকটা নিযন্ত্রিত হচ্ছে। সাম্প্রতিক কবিতার উৎসাহী পাঠকদের জানা উচিৎ যে সাম্প্রতিক কবিদের ঠিক পেছনে কা'রা দাঁড়িয়ে আছেন। সেজন্যেই পাঠকবা এ আলোচনায উৎসুক হতে পারেন, আশা করি। রবীন্দ্রোত্তর কবিতায় যেহেতু এঁরা তিনজনই একমাত্র জীবন্ত শক্তি, তাই এঁদের কবিতার আলোচনা দিযেই বইটি সম্পূর্ণ। আগেকার যুগের অনেক কবি আজ পর্য্যন্ত জীবিত আছেন কিন্তু সাম্প্রতিক কবিতায় তাবা শক্তি হিসেবে গ্রাহ্য নন; আগেকাব যুগেব অনেক কবি সাম্প্রতিক কবিতায় শক্তি হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন কিন্তু আজ আর তাঁরা স্বকীয সৃষ্টিতে জীবন্ত নন। কাজেই এই দুই ধরণের কবিব কবিতা এখানে আলোচিত হয়নি। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতা যাঁদের কাছে সত্যিকারের কিছু পেয়েছে এবং যাঁদেব কাছ থেকে পাবার আশা ফুরিয়ে যায়নি, তাঁদের কথাই আমি বলেছি।

কিন্তু তাঁদের কথাও নিঃশেষে বলা হযনি। তাঁদের কবি-মানসের ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা হয়েছে মাত্র। এ আলোচনাগুলোকে বরং বলা যেতে পারে, জীবনানন্দ দাশ---প্রেমেন্দ্র মিত্র---বুদ্ধদেব বসুর কবি-মনের ইতিহাস।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

তিনজন আধুনিক কবি

জীবনানন্দ দাশ

প্রেমেন্দ্র মিত্র

বুদ্ধদেব বসু

জীবনানন্দ দাশ

এখন থেকে পঁচিশ বছর আগে জীবনানন্দ দাশ কবিতা লিখ্‌তে সুরু করেন। পঁচিশ বছর আগেকার বাংলা কবিতায় যে কবিকে অত্যন্ত সঞ্চরণশীল দেখা যেত তিনি হচ্ছেন সত্যেন দত্ত। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা তখন শিখরারূঢ়—স্থিত, উজ্জ্বল। কিন্তু যে কোন তরুণ কবি কাব্যক্ষেত্রে প্রবেশ করে প্রথমেই যাঁকে দেখ্‌তে পেতেন তিনি রবীন্দ্রনাথ নন—সত্যেন দত্ত। তরুণ মনকে আকর্ষণ করবার মত পুঁজি সত্যেন দত্তের যথেষ্টই ছিল। ছন্দের ঝঙ্কার বা মিষ্টি কথার অনুপ্রাস ছাড়াও একটা সহজবোধ্য উদারতার আশ্রয় ছিল সত্যেন দত্তীয় কবিতায়। জীবনানন্দ সত্যেন দত্তকে দেখ্‌তে পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে তিনি খুঁজে বার করতে চান নি। এ ধরণের কবিতায়:

"সে কোন্ ছুঁড়ির চুড়ি আকাশ-শুঁড়িখানায় বাজে
চিনি মাখা ছায়ায় ঢাকা চুনীর ঠোঁটের মাঝে—(ঝরাপালক)

রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া যায় না—সত্যেন দত্তের স্বাক্ষরই এখানে উজ্জ্বল।

তখনকার দিনের নিরুত্তাপ সমাজ-জীবনে নূতন অনুভূতির উত্তাপ নিয়ে অকস্মাৎ যে একটি প্রবল ভাববন্যা এসে উপস্থিত হয়েছিল—তাকে আমরা বল্‌তে পারি অসহযোগ আন্দোলন। সুপ্ত দেশাত্মবোধ জেগে উঠে বাঙালীর মনে যতটা সাড়া তুল্‌ল, বাংলাদেশের আবেগ-প্রবণ কবিদের মনে তার চেয়ে অনেক বেশি তা সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। বাংলা কবিতায় অসহযোগ আন্দোলনের দান অবিস্মরণীয়। সত্যেন দত্তের দেশাত্মবোধই তাঁর শেষের দিকের কবিতাগুলোকে বিবেকানন্দীয়

সমাজ-চেতনায় রঞ্জিত করে দিয়ে গেছে। তাছাড়া এই দেশাত্মবোধ—জাতিকে নিবিড় আত্মীয়বোধে চিনে নেওয়া—কুসংস্কারের স্থবির নাগপাশ মাকড়সার জালের মত হেলায় দুপাশে সরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা থেকেই আরেকজন কবির নবজন্ম হল—তিনি বিদ্রোহী-কবি নজরুল ইস্‌লাম। সত্যেন দত্তীয় কাব্য-ভঙ্গীর পথে যাঁরা সার্থকতার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন, তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই নজরুল ইসলামের পথে এসে দাঁড়ালেন। 'ঝরাপালকে'র যুগে—কাব্য-রচনার শৈশবে জীবনানন্দের মধ্যে তাই আমরা একটি প্রাণপূর্ণ বিদ্রোহী সত্তার আবির্ভাব দেখ্‌তে পাই।

সত্যেন দত্তের সাবেকী পথ ছেড়ে তাঁরই নূতন পথে যে জীবনানন্দের বিচরণ সেই পদচিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর 'ঝরা পালকে'র 'দেশবন্ধু', 'হিন্দু মুসলমান', 'বিবেকানন্দ', 'পতিতা' প্রভৃতি কবিতায়। তারপর:

নৃত্য-গীত হাসি-অশ্রু-উৎসবের ফাঁদে
হে দুরন্ত দুর্নিবার—প্রাণ তব কাঁদে।
ছেড়ে গেলে মর্মন্তুদ মর্মর-বেষ্টন,
সমুদ্রের যৌবন-গর্জ্জন
তোমারে ক্ষ্যাপায়ে দেছে, ওহে বীর-শের
টাইফুন-ডঙ্কার হর্ষে ভুলে গেছ অতীত-আখের
হে জলধি পাখী! (নাবিক- 'ঝরাপালক')

এ-ধরণের কবিতাগুলোতে আমরা নজরুলের ধ্বনিই শুনতে পাই। নজরুলের সাহচর্য্য ছাড়া সেদিন মুক্ত যৌবন তার ভাষা খুঁজে পায়নি—সত্যেন দত্তে যৌবনের উত্তাল উদ্দামতা ছিল না, মোহিতলালের যতটুকু ছিল তা-ও উদ্দেশ্যমূলক—তাই গম্ভীর। নির্বাধ, উদ্দেশ্যহীন, যুক্তিহীন

4031

যৌবনের প্রাণ-চঞ্চলতায় নজরুল অপ্রতিদ্বন্দ্বী—আবেগ-ঘন মন নিয়ে জীবনানন্দ যে নজরুলের দিকেই ঝুঁকে পড়বেন তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

আমাদের স্বাধীনতা-আন্দোলনে সমরোত্তর রুশ-বিপ্লবের ছিটেফোঁটাও যে এসে না মিশেছিল এমন নয়। বিশ্বমানবের মৈত্রীর পরিকল্পনা বাংলাদেশের মনে যদিও নূতন নয়—চণ্ডীদাস বা বিবেকানন্দে যদিও তা আন্তরিকতার সঙ্গেই উপস্থিত—তবু সেই ঘুমন্ত ইচ্ছাকে রুশ-বিপ্লবের ধ্বনিই খানিকটা তখন জাগিয়ে দিয়েছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক' উপন্যাস তার সাক্ষী। 'অতি আধুনিক' বলে পরিচিত সাহিত্যিক গোষ্ঠীতে—যে গোষ্ঠীতে জীবনানন্দও একজন—এ অনুভূতির যে কাব্যিক বিকাশ হল তা শুধু বিশ্বমানবধর্ম্মীই নয়—বিশ্বপ্রকৃতিধর্ম্মী বা হুইটম্যান-ধর্ম্মী। অনুভূতিকে প্রসারিত করতে থাকলে মানুষের গণ্ডী ছাড়িয়ে তা বিশ্বপ্রকৃতিকে জড়িয়ে ধরবেই। হুইটম্যানের কাব্যিক জীবন সুরু তাই বাল্মীকির নমুনায়—সঙ্গীহারা এক পাখীর ডাকের ব্যথা তাকে সমস্ত জীবন অনুসরণ করে বেড়িয়েছে। অতি-আধুনিক কবি অচিন্ত্য সেনগুপ্ত যে প্রেরণায় লিখেছিলেন :

কীটের পাখার অস্ফুটতম বেদনা আমার হানে।

সে-প্রেরণাতেই জীবনানন্দ লিখেছেন :

"কীটের বুকেতে যেই ব্যথা জাগে আমি সে বেদনা পাই।"

অচিন্ত্য সেনগুপ্ত যখন লিখলেন :

আমার পরাণে ভাই
কোটি মানবের অশ্রুজলের জোয়ার শুনিতে পাই।—

জীবনানন্দও না লিখে পারলেন না :

> লভিয়াছে বুঝি ঠাঁই
>
> আমার চোখের অশ্রুপঙ্কে নিখিলের বোন ভাই।— 'ঝরাপালক'

'ঝরাপালক' বইটিকে জীবনানন্দের কবিতার ভিত্তিস্থল বলা যায় না—এই মাত্র বলা যায়, তখন জমি চাষ হচ্ছে, এতেই ফসল ফল্‌বে কিন্তু ফসলের অঙ্কুরও এ নয়। এ শুধু বাষ্প -মেঘ হয়ে জম্‌ছে গিয়ে আকাশের গায়—বৃষ্টি ঝরাতে পারে তেমন মৌসুমী বায়ু এখনো আসে নি। বৃষ্টি ঝরল —তাঁর দ্বিতীয় বই 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র ধূসরতা কবির জীবনের একটি অধ্যায় হলেও সব সময়েই তিনি জীবনের রুগ্নতাকে উপলব্ধি করেছেন বলে মনে হয় না। জীবনের পেছনে একটা প্রবল প্রাণশক্তি দেখ্‌তে পেয়েছেন তিনি, যা প্রায় বের্গসর Elan Vital এর মত :

> আমারে দিয়েছ তুমি হৃদয়ের যে এক ক্ষমতা
>
> ওগো শক্তি, তার বেগে পৃথিবীর পিপাসার ভার
>
> বাধা পায়, জেনে লয় নক্ষত্রের মতন স্বচ্ছতা।
>
> — (অনেক আকাশ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি')

কিন্তু Elan Vital-এর তাড়নায় হৃদয়ের আবেগের পথে এই যে জীবন খুঁজতে যাওয়া, তা সভ্য মানুষের জীবন নয়—প্রাণস্ফূর্তিতে প্রকৃতির কোলে যে সহজ জীবন বিস্ফারিত হয়ে উঠছে তার প্রতিই এই আবেগ মানুষকে আকৃষ্ট করে। তাই কবি বসন্তের রাত্রিতে পাখীর স্বরে জীবনের প্রতি একটা আকাঙ্ক্ষা শুন্‌তে পান ('পাখীরা' —ধূসর পাণ্ডুলিপি), তাই তাঁর মনে হয় :

নক্ষত্রের পানে যেতে যেতে
পথভুলে বার বার পৃথিবীর ক্ষেতে
জন্মিতেছি আমি এক সবুজ ফসল।
--(পিপাসার গান—'ধূসর পাণ্ডুলিপি')

তাঁর কাছে এ-জীবনের উপভোগ এত সম্পূর্ণ মনে হয় যে

শিশুর মুখের গন্ধ, ঘাস, বোধ, নক্ষত্র, আকাশ
আমরা পেয়েছি যারা ঘুরে ফিরে ইহাদের চিহ্ন বারোমাস—
(মৃত্যুর আগে– 'ধূসর পাণ্ডুলিপি)

তাদের কাছে আর মৃত্যুর কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে কোন দ্বিধা নেই। শুধু যে প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় অন্তরঙ্গতা থেকেই জীবনের উপর তার এই আকর্ষণ এসেছে তা নয়—জীবনের প্রতি এই দুরন্ত মোহ তাঁর প্রেমের উপলব্ধি থেকেই :

সে এক বিস্ময়
পৃথিবীতে নাই তাহা
* *
কোনো এক মানুষীর মনে
কোনো এক মানুষের তরে
যে জিনিষ বেঁচে থাকে হৃদয়ের গভীর গহ্বরে।
- (নির্জন স্বাক্ষর—'ধূসর পাণ্ডুলিপি')

যে-প্রেমের জন্যে জীবনের এত স্বাদ সে-প্রেম স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মনে জীবনের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। প্রাণের উপর প্রেমের শত অত্যাচারেও প্রাণ বেচে থাকে প্রেমকেই আবার খুঁজে নেবে বলে'—জীবনকে ছিঁড়েখুঁড়ে দিয়ে গেলেও প্রেমকে জীবন ভোলে না :

আগুন জ্বলিয়া গেলে অঙ্গারের মত তবু জ্বলে
আমাদের এ জীবন.....

- (প্রেম 'ধূসর পাণ্ডুলিপি')

কিন্তু প্রেম যে জীবনকে ছিঁড়ে দিয়ে যেতে পারে—এ সত্য-বোধ কবির আছে। তিনি প্রেমের আঘাতে আহত হয়েছেন—ব্যথিত হয়েছেন। এ ব্যথা ধীরে ধীরে তার মনে পাণ্ডুরতার ছায়া ফেলতে সুরু করেছে—তাঁর কণ্ঠে প্রাণশক্তির আর উদ্দামতা নেই—নম্র হয়ে এসেছে কণ্ঠ :

দেহ ঝরে, তার আগে আমাদের
ঝরে যায় মন। (১৩৩৩- 'ধূসর পাণ্ডুলিপি')

ক্ষণিকবাদের আপাত-ভাসমানতার আড়ালে ক্ষণিক-প্রেমের স্মৃতি মানুষের বুকে ব্যথা জাগাতে বাধ্য। কবি এখানে উজ্জ্বলতা হাতড়ে বেড়ালেও ধূসরতাকেই ভাষা দিয়েছেন :

তুমি শুধু একদিন- -এক রজনীর

নির্ঝরের বাতাসের মত
একদিন এসেছিলে,
দিয়েছিলে এক রাত্রি দিতে পারে যত।

('সহজ' ধূসর পাণ্ডুলিপি)

প্রেমের অ-স্থিরতা কবির জীবনকে যে ম্লান করে দিয়েছে সে অনুভূতি তাঁর প্রত্যক্ষ ও ঋজু—তখনো মনের বাঁক ঘুরিয়ে দিয়ে স্বপ্নে পলায়ন করবার ইচ্ছা তাঁর হয়নি—বিচার-শক্তি তখনো কাজ করে যাচ্ছে। রূপকথার মেয়েরা যে জীবন্ত নয় তারা যে স্রেফ ছায়ার শরীর—সব যাদু,

সবই মায়া সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ কবির নেই ('পরস্পর'—'ধূঃ পাঃ') আর সে সব মায়াবীদের সঙ্গে কবি তুলনা করে দেখাচ্ছেন এ-যুগের বারবণিতাকে, যারা এক সময় মোহ তৈরী করে তোলে কিন্তু আসলে যারা বাসি, মেকি। প্রেমের অপঘাতে বারবণিতার প্রেমের কথাও যদি কবির মনে উঁকি দিয়ে যায় তাহলে কি আমরা অনুমান করতে পারিনে যে তাঁর জীবন খুবই অসুস্থ হয়ে উঠেছে? সত্যি, প্রেম যে দেহ-বহির্ভূত কোনো শুভ্রতা নয় এ উপলব্ধিও কবির মনে এসে তখন উপস্থিত হয়েছে। প্রেমের শরীর থেকে প্রাক্তন রোমান্টিসিজ্‌ম্‌ ঝরে গেছে তখন তার দৃষ্টিতে। বার্ণার্ড শ যাকে বলেছেন: 'Tyranny of Sex'—শ' যে চোখে প্রেমকে দেখেছেন: "The whole world is strewn with snares, traps, gins & pitfalls for the capture of men by women"—সে চোখ নিয়েও জীবনানন্দ প্রেমের দিকে তাকাচ্ছেন ('ক্যাম্পে'—ধূঃ পাঃ) :

আমার হৃদয়—এক পুরুষ হরিণ
পৃথিবীর সব হিংসা ভুলে গিয়ে
চিতার চোখের ভয়—চমকের কথা সব পিছে ফেলে রেখে
তোমারে কি চায় নাই ধরা দিতে?

এ ধারণা নিয়ে কবি তাই আর জীবনকে আগেকার অনাবিল, উদ্দাম প্রফুল্লতায় গ্রহণ করতে পারেন না। তাঁর মনে হয়:

মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়—প্রেম নয় কোনো এক বোধ কাজ করে।
—(বোধ—ধূঃ পাঃ)

সে-বোধ উদ্দেশ্যহীন, চঞ্চল। ভালোবাসা আর প্রত্যাখান, পাওয়া

আর ছেড়ে যাওয়া—পৃথিবীর কুশ্রীতাকে জড়িয়ে থাকা-ই তার ধর্ম্ম! শুধু তাই নয়, কবি এবার জীবনকে তার ম্লান হৃদয় দিয়ে আরেকটু গভীরভাবে দেখ্‌তে চেয়েছেন। এবার জীবন আর তাঁকে উপভোগের সম্পূর্ণতা দান করছে না—জীবনের অ-স্থিরতা আর মৃত্যুর রহস্যময় স্থিরতা জেনে নিয়ে মৃত্যুকেই তিনি ভালোবেসে ফেল্‌তে চাচ্ছেন। এখন তিনি প্রায় দার্শনিক :

যে ভালোবেসেছে, তার হৃদয়ের ব্যথার মতন ;-
কাল যাহা থাকিবেনা, আজই যাহা স্মৃত হয়ে আছে,—
দিন-রাত্রি—আমাদের পৃথিবীর জীবন তেমন।

—(জীবন—ধূঃ পাঃ)

কিন্তু কবির মনে দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেলেও, তাদের স্থায়া আসন সেখানে নেই। পরের মুহূর্ত্তেই কবি আবিষ্কার করে নেন যে তিনি কবি। স্বপ্নের হাতে নিজেকে সমর্পন করে কবি পৃথিবীর জীবনের গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে চান—সান্ত্বনা খুঁজে নেন। স্বপ্ন কবির এক অপূর্ব্ব সম্পদ—তাকে সত্য বল্‌তে ভাব্‌তে একটুও দ্বিধা হয়না তাঁর। শেলীর রোমান্টিসিজ্‌মের জন্ম যে কারণে: "I fall upon the thorns of life! I bleed!"—সেই একই কারণে জীবনানন্দ পাকা রনিয়াদে রোমান্টিক হয়ে উঠেছেন :

ভুলে যাও পৃথিবীর ঐ ব্যথা—ব্যাঘাত—বাস্তব!
সকল সময়
স্বপ্ন—শুধু স্বপ্ন জন্ম লয়
যাদের অন্তরে

* * *

পৃথিবীর দিন আর রাত্রির রব
শোনে না তাহারা !

*

দিনের উজ্জ্বল পথ ছেড়ে দিয়ে
ধূসর স্বপ্নের দেশে গিয়া
হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার নদী
ঢেউ তুলে তৃপ্তি পায়—

(স্বপ্নের হাতে—ধূঃ পাঃ)

এখানেই 'ধূসর-পাণ্ডুলিপি'র কবির জন্ম হল।

মগজের কাজকে বাতিল করে দিয়ে টেনিসনের Lotos Eaters-এর মতো নিরুত্তেজ অবসর উপভোগের আকাঙ্ক্ষা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'অবসরের গানে'ই পাওয়া যায়। কিন্তু মগজকে নির্ব্বাসনে পাঠালে বিশ্বাসের যে একটা সুগন্ধ, দৃঢ় ভিত্তি গড়তে হয় সেখানে জীবনানন্দ তা করতে পারেন নি। কবির মনে স্বপ্ন ছিল—কিন্তু স্বপ্নের জগৎ তখনো তৈরী হয়নি। ছোট ছোট সিম্বলের আভাস সেখানেও আছে—যেমন, অতীতের অনুভূতির সিম্বল 'কার্ত্তিক মাঠের চাঁদ'—প্রেমের অনুভূতির সিম্বল কার্ত্তিকের ফলন্ত মাঠ—বিরহের সিম্বল ধানকাটা মাঠ। কিন্তু তখনও তাঁর কবিতায় একটি 'সিম্বলিক' পরিবেশ নিবিড় হয়ে ওঠেনি। এ পরিবেশ পরিণতি লাভ করেছে 'বনলতা সেন' বইটিতে। এখানে তিনি ইয়েট্‌স-এর মতো অতীত জগতে আর স্বপ্নের বস্তুতে সৌন্দর্য্য খুঁজে পেয়েছেন। এমন একটি জগতের জন্য আকাঙ্ক্ষা তাঁর ব্যক্ত হয়েছে যেখানে হৃদয়ের ইচ্ছা আর অনুভূতির ও কল্পনার উল্লাস

তৃপ্তি পেতে পারে! ইয়েট্‌সেরই মতো জীবনানন্দও এ-সময়ে বল্‌তে পারতেন: "I have no speech but symbol" 'নাটোরের বনলতা সেনের' দিকে কবির প্রেমকাতর হৃদয় অতীতের সমস্ত মোহ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়—তাঁর অন্তহীন প্রেমানুভূতি কেন্দ্রীভূত হয়েছে বনলতা সেনে:

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য, অতি দূর সমুদ্রের পর
হাল ভেঙ্গে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন'
পাখীর নীড়ের মত চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

—(বনলতা সেন)

এ-সঙ্গে যদি আমরা ইয়েট্‌স-কে স্মরণ করি তাহলে শুনতে পাব তিনি বল্‌ছেন:

For that pale breast of lingering hand
Come from a more dream-heavy land
A more dream-heavy hour than this.

অথবা

When my arms wrap you round I press
My heart upon the loveliness
That long has faded from the world.

নাটোরের একটি সাধারণ মেয়ে—বনলতা সেন, তাঁকে কবির প্রেমানুভূতিই কারুকার্য্যখচিত করে তুলেছে। কবির আবেগের সিম্বল হয়ে উঠেছে সে। বনলতা সেন এখন তাঁর প্রেমের নিবিড়তার মূর্ত্তি ছাড়া আর কিছু নয়।

ইয়েট্‌সের মতোই জীবনানন্দের মনে প্রেমের অভিজ্ঞতা একটা বিষণ্ণ হতাশার সুর বয়ে আনে। ইয়েট্‌সের চাঁদ তখন 'crumbling moon'—জীবনানন্দেরও তাই :

হয়ত এসেছে চাঁদ মাঝরাতে একরাশ পাতার পিছনে
সরু সরু কালো কালো ডালপালা মুখে নিয়ে তার।
-(কুড়ি বছর পরে—বনলতা সেন)

প্রেম ইয়েট্‌স্‌কে আনন্দের চেতনা এনে দিতে পারে নি—কেননা জীবনকে সহজভাবে গ্রহণ করবার বিশ্বাস তার কই? এ যুগে জীবনকে সহজভাবে গ্রহণ করবার আবেগ নিয়ে যারা জন্মগ্রহণ করে জীবনের জটিলতার সঙ্ঘাতে বিশ্বাস তাদের বিধ্বস্ত হতে বাধ্য। "She bid me take life easy as the grass grows on the weirs"—কিন্তু তেমন সহজভাবে জীবনকে ভাববার উপায় ছিলনা ইয়েট্‌সের। এ বিশ্বাস জীবনানন্দের মনেও দানা বাঁধতে পারে নি—কিন্তু তার ইচ্ছা আছে, সহজ জীবনের প্রতি প্রবল আকর্ষণ আছে তাঁর :

আমারো ইচ্ছা করে
ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার
শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে। (ঘাস—ধূসর পাণ্ডুলিপি)

সৌন্দর্য্যের অ-স্থিরতা উপভোগে যে ব্যাঘাত জীবনকে ক্লান্ত করে তোলে, যাতে বিষণ্ণ হয়ে ওঠে মন—তা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে ইয়েট্‌স্ যেমন চান :

I would that we were, my beloved, white birds on
the foam of the Sea !

তেমনি 'জীবনের টুকরো টুকরো সাধের ব্যর্থতা ও অন্ধকার' এড়াবার জন্যে জীবনানন্দের ইচ্ছা :

আমি যদি হতাম বনহংস
বনহংসী হতে যদি তুমি
কোনো এক দিগন্তের জলসিড়ি নদীর ধারে
ধানক্ষেতের কাছে।

—(আমি যদি হতাম— বঃ সেঃ)

এখানে হয়ত অনেকে বলবেন—এ হল কবির জীবন থেকে পলায়ন। কবি উত্তর দেবেন—'বাইরের জীবন থেকে এ হচ্ছে সত্যিকারের জীবনের মধ্যে পলায়ন'—এ কথাই বলা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক, কেননা তিনি আর এখন অসংলগ্নতায় ভেসে বেড়াচ্ছেন না, একটি স্বসম্পূর্ণ আলাদা পরিবেশ তৈরী করে ফেলেছেন। সেখানে চিলের ডাক বিরহের স্মৃতি আনে (হায়, চিল—বঃ সেঃ), বুনো হাঁসের উড়ন্ততায় প্রিয়-স্মৃতিতে ভরে যায় হৃদয় (বুনো হাঁস—বঃ সেঃ), সেখানে স্বপ্নের 'শঙ্খমালা' আসা-যাওয়া করে, ফাল্গুনের জ্যোৎস্নায় হরিণেরা খেলা করে' শেফালিকা বোসের হাসি জাগিয়ে তোলে (হরিণেরা—বঃ সেঃ) তারপর সমস্ত অতীত জেগে উঠেছে সে-জগতে। ইয়েটসের ধারাবক্ষী ডি, লা, মেযার অতীতের স্পর্শে হৃদয়কে যে-ভাবে অনুভব করেছেন :

"Our hearts stood still in the hush of an age gone by—"

জীবনানন্দও অতীতের গুঞ্জরণে তেমনি নিজেকে খুঁজে পেয়েছেন :

ভারত সমুদ্রের তীরে
কিংবা ভূমধ্য সাগরের কিনারে
অথবা টায়ার সিন্ধুর পারে

আজ নেই কোন এক নগরী ছিল একদিন
কোন এক প্রসাদ ছিল

*　　　*　　　*　　　*

আমার বিলুপ্ত হৃদয়, আমার মৃত চোখ, আমার বিলীন স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা
আর তুমি নারী—
এই সব ছিল সেই জগতে একদিন। (নগ্ন নির্জন হাত—বঃ সেঃ)

যে নক্ষত্রেরা আকাশের বুকে হাজার হাজার বছর আগে মরে গিয়েছে
তারাও কাল জানালার ভিতর দিয়ে অসংখ্য মৃত আকাশ সঙ্গে করে এনেছে;
যে রূপসীদের আমি এশিরিয়ায়, মিশরে, বিদিশায় মরে যেতে দেখেছি
কাল তারা অতি দূর আকাশের সীমানায় কুয়াশায় কুয়াশায় দীর্ঘ বর্শা হাতে করে
কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে গেছে যেন। (হাওয়ার রাত— বঃ সেঃ)

যে জগত জীবনানন্দ তৈরী করে নিয়েছেন আবেগের তাড়নায়, তা দৃশ্যের বিষয়ীভূত নয় উপলব্ধির বিষয়ীভূত। স্বচেতন আবেগে তৈরী এ উপলব্ধি, তা দিয়ে বিভিন্ন পর্য্যায়ের শিল্পভঙ্গী তৈরী হ'তে পারে। তাতে জীবনানন্দ সিটওয়েল-গোষ্ঠির মত ইমেজিষ্ট (Imagist) হয়ে পড়েছেন স্থানে স্থানে, ক্বচিৎ সুর-রিয়্যালিজ্‌মও যে উঁকি দিয়ে যায়নি তা নয়। অস্‌বার্ট সিট্‌ওয়েল যে চোখে দেখেন: "Hot yellow grass, a yellow palm rising" অথবা উপলব্ধি করেন "Droning heat" খুঁটে খাচ্ছে নীরবতা—ঠিক তেমনি জীবনানন্দও দেখতে পান: "রূপালি চাঁদের হাত শিশিরে পাতায়।" অথবা "প্রতিভার দীর্ঘবাহু বাড়ায়ে দিয়েছে" অথবা "রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ।" কিন্তু এই উপলব্ধির জগৎ বা স্বপ্নের জগৎ যে তাঁর নিজের তৈরী এ সম্বন্ধে কবি ক্রমেই সচেতন হয়েছেন: "মরণের হাত ধরে স্বপ্নছাড়া কে

বাঁচিতে পারে ?"—(স্থবির যৌবন—কবিতা ১৩৪৪)---অনুরূপ সচেতনতা ডি, লা মেযারেরও ছিল : "The skill of words to sweeten despair. where life has but one dark end."

শেষে একদিন কবি শুনতে পান : "স্বপ্নের ধ্বনিরা এসে চলে যায় : স্থবিরতা সব চেয়ে ভালো" ; (স্বপ্নের ধ্বনিরা —'কবিতা' ১৩৪৪)।

শীতের রাতে তাঁর 'হৃদয়ে মৃত্যু আসে'—'শিশিরের মত, হলুদ পাতার মত' ঝরে যায় হৃদয়---জানতে পারেন কবি 'কোকিলের গান ব্যবহৃত হয়ে গেছে', 'সিংহ অরণ্যকে পাবে না আর,' পৃথিবী 'কোনোদিন কিছু খুঁজে পাবে না' (শীতরাত—'কবিতা' ১৩৪৪)। কবির এই স্বপ্নভঙ্গ তাঁকে বিনষ্ট করে দিয়ে যায়নি, খুলে দিয়েছে নতুন পথ। "I grow old among dreams" বলে ইয়েটসও নূতন পথের সন্ধান পেয়েছিল ঠিক এমনি স্বপ্নভঙ্গের পর : ✓

"Through all the lying days of my youth
I swayed my leaves & flowers in the sun
Now I may wither into the truth."

যৌবনের শেষে স্থবিরতার পথে সত্যকে খুঁজতে এগিয়ে গেছেন জীবনানন্দ। এ তাঁর এক সম্পূর্ণ নূতন জগতে অভিযান। অথবা বলা যায় সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টি নিয়ে এবার তাঁর অভিযান। এখন আর চোখ তাঁর স্বপ্ন-মেদুর নয়, জিজ্ঞাসায় তা প্রখর। মন ছেড়ে মননের পথে এসে কবি দেখলেন, আজকের দিনের জীবন আমাদের জটিল সমস্যায় ঘেরা। বিংশ শতাব্দীর প্রশ্নসমাকীর্ণ জীবনকে যখন তিনি বুঝতে চাইলেন তখন তাঁর ভাষা থেকেও স্বপ্নের সেই প্রাক্তন কোমল-

ঋজুতা ঝরে পড়েছে, ক্রমেই এসেছে তাতে গদ্যভঙ্গী, মিশেছে জটিলতা। আজকের দিনে হৃদয়ের আকুতি নিয়ে যে বাচা যায় না, যে-শৃঙ্খলায় তন্ময় হয়ে আছে আকাশ, বাতাস, নদী তা যে কবির হৃদয় খুঁজে পায় না—বাস্তব-জীবনের সঙ্গে সংঘর্ষে আবেগের জীবনের এই যে পরাজয় তার আভাস পাওয়া যায় তার 'পারমা' (নিরুক্ত) কবিতায়। এই আকাশ, বাতাস, নদী—এরা পৃথিবীর পারমাবই অভিজ্ঞান যা হয়ত এ-শতাব্দী অবসান করে দেবে। মোহমুক্তি হয়েছে বটে কবির কিন্তু তার ব্যথাকে তিনি সঙ্গী করে নিয়েছেন। এই ব্যথা নিয়ে, পৃথিবীর স্বাদ নিয়ে তিনি যদি জীবনের সত্যিকারের সার্থকতা খুঁজতে চান তবে তিনি যুক্তির হাতেও জীবনের মানের নাগাল পাবেন না, তলিয়ে যাবেন অন্ধকারে :

এই তো জীবন
সমুদ্রের অন্ধকারে প্রবেশাধিকারে
নিপট আঁধার ;
ভালো বুকে পুনরায়
সাগরের সৎ অন্ধকারে নিষ্ক্রমণ

এই অন্ধকারাচ্ছন্ন পারিপার্শ্বিক থেকে একটু মুক্তি পেয়েও তিনি যা দেখছেন তা খুব আশাপ্রদ নয় :

সকলই প্রবেশের পথ বয়ে গেছে
এবং প্রবেশ করে পুনরায় বাহির হবার
অবরোধ অন্ধকার থেকে এক প্রান্তরের আলোকের পথে ;
প্রান্তরের আলো থেকে পুনরায় রাত্রির আঁধারে।

জীবনের উপর এই যে প্রান্তরের আলো তার কোনো আধ্যাত্মিক

উদ্দেশ্য তিনি খুঁজে পান নি। এখানে তিনি বিংশ শতাব্দীর মন প্রায় তৈরী করতে সুরু করেছিলেন। তারপর প্রায় বৈজ্ঞানিকের মতো তিনি প্রশ্নও করেছেন :

জীবাণুর থেকে আজ কৃষক, মানুষ
জেগেছে কি হেতুহীন সংপ্রসারণে··· ?—(ক্ষেতে প্রান্তরে—নিরুক্ত)

প্রকৃত বৈজ্ঞানিক খুসী আছেন এ মীমাংসা নিয়ে যে জীবনের বিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যই প্রকৃতি থেকে ক্রমে বিচ্ছিন্ন হয়ে তা প্রকৃতি জয় করে চল্‌বে। কিন্তু জীবনানন্দ বিজ্ঞানের এ-ধারাকে গ্রহণ করেন নি, 'প্রকৃতি-গত সহজ মানুষে এসেই তাঁর কল্পনা থেমে গেছে (ক্ষেতে প্রান্তরে)।

জীবনানন্দের ইদানীংকার দৃষ্টিভঙ্গীর একটা পরিণত রূপের আভাস আছে 'বিভিন্ন কোরাস' (নিরুক্ত—আশ্বিন ১৩৪৯) কবিতায়। আমাদের জীবনের মধ্যে প্রবেশ করে কবি যা দেখতে পেয়েছেন তারই বর্ণনা আছে একসঙ্গে গ্রথিত চারটি কবিতায়। আমাদের জীবন নিরুত্তাপ, আচারনিষ্ঠ, শালীন ; এই নিয়েই আমরা খুসী—স্বপ্নও মাঝে মাঝে উঁকি দেয় :

আমাদের হৃদয়ের নদীর উপর দিয়ে ধীরে
এখনো যেতেছে চলে কয়েকটি শাদা রাজহাঁস।

কিন্তু আমাদের পর আমাদের সন্ততিদের জন্যে নিরেট বাস্তবতাময় জীবন যদি আসে, যদি তখনকার দার্শনিক মতবাদ মানুষের জীবনের স্বার্থকতা খুঁজে না পায়, তখন 'মূর্খ আর রূপসীর ভয়াবহ সঙ্গম এড়ায়ে স্থির হয়ে রবে না কি সন্ততিরা ?'—আর এভাবে 'মানুষের শেষ বংশ লোপ পেলে কে ফিরায়ে দেবে জীবনের বাস্তবতা ?' কাজেই বাস্তবতার

ধার ঘেঁসে লাভ কি? স্বপ্নই সত্য। দীর্ঘযাত্রা শেষেও কবি স্বপ্নকে ভোলেন নি।*

'সময় কীটের মত কুরে যায় আমাদের দেশ'—'দীপ্তিময় দিনের' 'সান্দ্র বিশ্বাস' আমাদের পিতা-পিতামহদের ছিল, আমরা সে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। ব্যক্তিকেন্দ্রিকতায় আচ্ছন্ন আমরা: 'আমাদের সন্ততিও আমাদের হৃদয়ের নয়।'

আমরা মধ্যম পথে বিকেলের ছায়ায় রয়েছি,
একটি পৃথিবী নষ্ট হয়ে গেছে আমাদের আগে,
আরেকটি পৃথিবীর দাবী
স্থির করে নিতে হলে লাগে
সকালের আকাশের মতন বয়স।

সেই প্রভাতের পরিচ্ছন্ন নবীনতা পেতে হলে একটি পরিপূর্ণ অন্ধকার রাত্রি চাই। এই 'স্বধর্ম্মনিষ্ঠ' রাত্রি আসে প্রকৃতিগত জীবনের বৃত্তে, মাধ্যমিক জীবনে নয়। প্রকৃতির রাজত্বে

রাত্রি তার অন্ধকার ঘুমাবার পথে
আবার কুড়ায়ে পায় এক পৃথিবীর মেয়ে, ছেলে।

কিন্তু এখন যে পৃথিবীব্যাপী প্রদোষ তা কী সূচনা করছে? কবি সে সম্বন্ধে নিঃসংশয় হ'তে পারছেন না। এ ক্রান্তি জীবনের না মরণের? 'আকাশের ফিকে রং ভোরের কি সন্ধ্যার আঁধার?'

এ সংশয়বিদ্ধ চেতনা এসেছে তাঁর স্বপ্নভঙ্গের পরও স্বপ্নলগ্ন হয়ে থাকার ফলে। তিনি সত্যের প্রতি সুবিচার দেখাতে পারছেন না। প্রকৃতিগত সহজ জীবন আর স্বপ্ন তার মনে সারাক্ষণ গুঞ্জরণ তুল্‌ছে—

বিজ্ঞানের বাঁধা-সড়কে তিনি যাবেন না। অথচ বৈজ্ঞানিক যুক্তির ধারায় জীবন অন্য খাতে বয়ে যাচ্ছে তিনি লক্ষ্য করছেন! হতে পারে যে একটি জগৎ (অনুভূতির জগৎ) ভেঙে দিয়ে আরেকটি জগতে (বাস্তব জগৎ) তাঁকে প্রবেশ করতে হয়েছে বলেই দ্বিতীয় জগতের স্থিরতা সম্বন্ধে মনে তিনি আশ্বাস পাচ্ছেন না। এই সঙ্কট তাঁর মনকে, ভাষাকে অনবরতই জটিল করে তুলছে। কবির নিজের কথায়ই তাঁর ইদানীংকার কবিতা সম্বন্ধে শেষ উক্তি করা যায়: "সম্প্রতি আমার কবিতা জটিল হয়ে পড়েছে। আমার শেষের দিকের কবিতায় তেমন প্রসাদ নেই। দোষ হোক, গুণ হোক—এ জিনিষ তবু অস্বাভাবিক নয়, এবং কাব্য জীবনের একটি অধ্যায় শুধু; শক্তি, ইচ্ছা ও সৎ অন্তঃকরণ থাকলে ভবিষ্যতের দিকে হয়তো বা নিয়ে যাব কবিতাকে।"*

সে-ভবিষ্যৎ আমরাও আশা করে রইলাম।

* লেখকের কাছে লেখা জীবনানন্দ দাশের চিঠি

প্রেমেন্দ্র মিত্র

"বৃহত্তর সত্তার জন্য ব্যাকুলতা যদি এদের ভেতর থেকে না জাগে তাহলে বাইরে থেকে টেনে ঠেকা দিয়ে কতক্ষণ রাখা যাবে?... ..আমি সেই মামুলী সত্যে বিশ্বাস করি যে, মানুষের সত্যকার মুক্তি তার নিজের ভেতরকার প্রেরণা ছাড়া আসে না- -আমি চাই ওই বীভৎসতা, ওই পঙ্গুতা ও অন্ধতা সম্বন্ধে তাদের সচেতন করে' তুলে বিপুল অসন্তোষ তাদের মনে রোপণ করতে। বৃহত্তর সত্তার ব্যাকুলতা সেই অসন্তোষ থেকেই আসবে বলেই আমার বিশ্বাস। .. দেহের শ্রমের পরিবর্তে ওরা যা পায় জীবন নির্বাহের পক্ষে তা যথেষ্ট নয় তা আমি জানি এবং ওদের মানসিক ও নৈতিক দৈন্য যে আর্থিক দৈন্যের ফল তাও আমি জানি। . পৃথিবীর সমস্ত মানুষের সত্যকার আর্থিক স্বচ্ছলতা যে বর্ত্তমান সমাজ-গঠনের শুধু সংস্কার নয়, আমূল পরিবর্ত্তন না করলে হবে না, সে কথা নূতন করে প্রমাণ করবার জন্যে Socialist, Anarchist, Syndicalist-এর যুক্তির পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন মনে করি। এই আমূল পরিবর্ত্তন অবশ্য মানব সমাজের সত্যকারের জাগরণ ছাড়া কি সম্ভব?'

প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক' উপন্যাসের অশান্ত কর্ম্মকারের এই কথাগুলো কতগুলো সাজানো কথা মাত্র নয়। এ ধরণের চিন্তা কুড়ি বছর আগে বাংলাদেশের ভাব-রাজ্যে এসে সত্যি উপস্থিত হয়েছিল। সে-সময় জাতীয় মুক্তির আন্দোলনে ভারতবর্ষ উদ্দীপ্ত- আর তার সঙ্গে এসে মিশেছে রুশ-বিপ্লবের ধ্বনি---মানবের মুক্তির বাণী-বাহক। মুক্তির এই অপূর্ব্ব ধ্বনি সেদিনের বাংলা কবিতায় প্রতিধ্বনিত না হয়ে যায়নি। একটু পেছনে চোখ ফেরালে আজও তার চিহ্ন পাওয়া যাবে নজরুল ইস্‌লাম এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের তখনকার কাব্য-সাধনায়। অবশ্য মানুষের সমাজকে কবিতার উপজীব্য করে তোলা তার আগে কোনো

বাঙালী কবির পক্ষে সম্ভব হয়নি। হয়ত কাব্যে সৌন্দর্য্যহানির সম্ভাবনায় বাঙালী কবিদের হৃদয় সেই পঙ্কিল জীবনকে কাব্যের বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেছে। বাংলা সাহিত্যের 'অতি আধুনিক' আন্দোলন সাহিত্যের এই শুচিতার আতিশয্যকেই আক্রমণ করবার চেষ্টা করেছিল। 'অতি-আধুনিক' সাহিত্যিকরা আর কিছু না করুন—সমাজের বীভৎসতা, পঙ্গুতা ও অন্ধতা সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে দেবার একটা সজ্ঞান চেষ্টা তাঁদের অনেকেরই ছিল। কিন্তু কবির ধর্ম্ম শুধু মানুষকে সচেতন করে দেওয়াই নয়—মুক্ততর জীবনের জন্যে মানুষের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলাই তাঁদের হৃদয়ের ধর্ম্ম। তাই সেদিনের সার্থক কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমা' কবিতা বইটির পাতায় পাতায় 'অবনত মানব সমাজের সত্যকারের জাগরণ' ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

কেবল রাষ্ট্রিক বা সামাজিক কতগুলো মতবাদ নিয়ে কেউ কবি হয়ে উঠতে পারেন না। কবির জীবনের সঙ্গে যদি তেমন কোনো মতবাদের সামঞ্জস্য থাকে তবেই কবিতায় আমরা একটা বলিষ্ঠ সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করতে পারি। মতবাদের শুক্‌নো খোলসে কাব্যের চেহারা যা হয়ে ওঠে তাতে মনে একটা অভিনব বোধ তৈরী হওয়া দূরে থাক্, মেজাজ বিগ্‌ড়ে যায়। মানুষের মুক্তির কথা আজ পর্য্যন্ত ধর্ম্মে, দর্শনে, বৈজ্ঞানিক বা রাষ্ট্রিক মতবাদে অনেকভাবেই বলা হয়েছে। তাকে কবিতার বিষয় করে নিতে হলে কবিকে শুধু সেই মতবাদে আস্থাবান হলেই চলবে না—পুঁথির মারফৎ মানুষকে চিনলে চলবে না—হৃদয় দিয়ে সমস্ত মানুষকে চিনে নিতে হবে। কাব্যবস্তুকে কবি পঞ্চেন্দ্রিয়ের পথে জানেন না, জেনে

নেন হৃদয়েব পথে যাকে বলা যায় ষষ্ঠেন্দ্রিয। মানুষের প্রতি এই হৃদ্যতা যার নেই মানুষকে নিয়ে কবিতা রচনা তার পক্ষে বিড়ম্বনারই নামান্তর। ঊনিশ শতকে ইংরেজি কবিতায় একমাত্র Walt Whitman-ই এই হৃদ্যতার স্বাক্ষব বেখে গেছেন। রবীন্দ্রনাথে এই হৃদ্যতাব অভাব নেই—কিন্তু ভারতীয় দর্শনের দৃষ্টি নিয়েই রবীন্দ্রনাথ মানুষের দিকে তাকিয়েছেন। অবনত মানুষের প্রতি তাঁর আন্তরিকতা ছিল এজন্যে—তিনি উপলব্ধি করতেন, এক আনন্দে থেকেই সর্ব্বভূত জন্ম নিয়েছে। অবনত মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার সঙ্গে পরিচিত হযে' নাড়ীর সম্বন্ধে তাদের চিনে নেওযা আলাদা জিনিয। তাদের সম্বন্ধে লবেন্সের ভাষায় 'Blood-Knowledge' একমাত্র প্রেমেন্দ্র মিত্রের অনুভূতিতেই আমরা দেখতে পাই। সে-অনুভূতিতে কবি তাঁর সত্তার পার্থক্য ভুলে যেতে বাধ্য। 'অবনত মানবে'র সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে তাঁর আর কোনো দ্বিধা থাকে না। ঘরের বন্ধন, শ্রেণীগত স্বার্থের বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে তিনি পৃথিবীব বিপুল জনসাধাবণের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে এসে দাঁড়ান। তাই Walt Whitman বলেন :

I am enamoured of growth out of doors
Of men that live among cattle or taste of the ocean or woods
Of the builders & steerers of ships and the wielders of axes and
The drivers of horses.

শ্রমিকের জীবনের সঙ্গে মিতালি করে—সে-জীবন সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতা জেগে ওঠে :

We primaeval forests felling
We the rivers stemming, vexing we & piercing deep the mines within

We the surface broad surveying we the virgin soil up-heaving

.. not for us tame enjoyment.

প্রেমেন্দ্র মিত্রও উপলব্ধি করেন 'বরের দেওয়াল' 'ফেটে চৌচির' হয়ে গেছে। তাই বলেন :

আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের,
মুটে মজুরের
আমি কবি যত ইতরের।

* * *

কামারের সাথে হাতুড়ি পিটাই
ছুতোরের ধরি তরপুণ,
কোন সে অজানা নদী পথে ভাই
জোয়ারের মুখে টানি গুণ।
পাল তুলে দিয়ে কোন সে সাগরে
জাল ফেলি কোন দরিয়ায়
কোন সে পাহাড়ে কাটি সুড়ঙ্গ
কোথা অরণ্য উচ্ছেদ করি ভাই
—ঠাঁর নাই। (প্রথমা)

কর্মশীল শ্রমিক-জীবনের বিস্তৃত পরিধি সম্বন্ধে প্রেমেন্দ্র মিত্রও সচেতন :

তপতী কুমারী মরু চাহে আজ প্রথম পায়ের ধূলি
অজানা নদীর উৎস ডাকিছে গোমটা আধেক খুলি।
নিসঙ্গ গিরিচূড়া
হিম তুষার শয়নে আমারে স্মরিছে বিরহাতুরা।

* * *

সোহাগের ভাষা কখন শিখি যে নাই মোটে অবসর। (প্রথমা)

শ্রমিকের জীবনের শরীক হয়ে সভ্যতার সত্যকার মানে কবির দৃষ্টিতে পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। তিনি বুঝতে পারেন মানুষ প্রকৃতির দাস নয়, প্রকৃতিই মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে উৎসুক :

মাটি মাগে ভাই হলের আঘাত
সাগর মাগিছে হাল
পাতাল-পুরীর বন্দিনী ধাতু
মানুষের লাগি কাঁদিয়া কাটায় কাল। (প্রথমা)

এ জীবনধারার সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চললে স্বাভাবিক ভাবে জড়বাদী দৃষ্টি এসে যায় কবির চোখে। মানুষকে তিনি কোনো অপার্থিব ভাব-রূপের বস্তু-দেহ বলে ভাবতে পারেন না। মানুষকে বলেন :

মাটির ঢেলা মাটির ঢেলা
ডাক্‌ছে তোরে তোর মাটি— (প্রথমা)

যদি দেবতা বলে কিছু থেকে থাকে—তবে মানুষই তা-ই। তার জন্যে কবি কল্পস্বর্গলোক হাতড়ে বেড়ান না :

দেবতার জন্ম হ'ল।
দেবতার জন্ম হ'ল সুপবিত্র সুন্দর প্রভাতে
মাটির কোলের পরে—
মার বুকে (প্রথমা)

কিন্তু এ-দেবতার সম্মান আমরা করতে পারিনি—অবহেলায়, অশ্রদ্ধায়, নির্য্যাতনে

বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে বন্দী মোর ভগবান কাঁদে
কাঁদে কোটি মার কোলে অন্নহীন ভগবান মোর। (প্রথমা)

আমাদের চোখে স্বপ্ন আছে, মিলনের ছন্দ অজানা নেই, আমরা সৃষ্টি করেছি ভালোবাসা তবু তা থেকে আমরা ভ্রষ্ট। 'মাটির ঢেলা' পৃথিবী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ঘুরছে—তারি সন্ততি আমরা, তাই হয়ত লক্ষ্য ভুলে গেছি। 'আদি পঙ্কের ঋণ' আমাদে শোধ করতে হয়, তাই—

বাগীবন্ধনে বাঁধিব যাহারে তাহারে পরাই বেড়ী,
—সে মোর আপন ভাই।
জীবন যাহারে ঘিরি গুঞ্জরে, তারি সুখের আলো
দুই হাতে আগলাই। (প্রথমা)

শুধু তা-ই নয়। লোভের বিবেকহীন তাড়নায় আজকের দিনের মানুষ যে কতটুকু স্বার্থপর হয়ে উঠেছে তার সীমা নেই। পেশীতে আর ঘামে যারা গড়ে তুলছে মানুষের সভ্যতা—তাদের জীবনের প্রতি এতটুকু কৃতজ্ঞতা আমাদের নেই। তাদের দিয়ে যখন আর আমাদের কাজ চলে না ভাঙা জাহাজের মত তখনই তারা বাতিল—বেকার:

দুনিয়ার কড়া চৌকীদারী যে ভাই
হুঁসিয়ার সদাগরী,
হালে যার পানি মিলে না কো আর, তারে
যেতে হবে চুপে সরি। (প্রথমা)

মানুষের অবিচার আর লোভই যে সমাজে পঙ্কিল জীবন সৃষ্টি করে চলেছে সমাজ-সচেতন কবির মনে এ নিয়ে আর প্রশ্ন থাকতে পারে না। কবি মানুষের অপরাধকে সামাজিক অপরাধ বলেই মনে করেছেন—আর তাই চেয়েছেন নিজেকেও অপরাধীর দলভুক্ত করে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সেই কলঙ্কিত, অবনতদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে। 'জীবন-বিধাতা'কে তিনি আর সৌন্দর্য্যমুগ্ধের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাতে পারেন না:

জীবন বিধাতা, আজি বিদ্রোহীর লহ নমস্কার !
লহ এই প্রীতিহীন প্রণিপাতখানি।

* * *

নশ্বর মৃত্তিকা গেহে,
জর্জ্জর তৃষিত দীন, যত নরনারী,
ধূলিব মলিন অঙ্কে ধূলিসম শেষে,
বিদায় লইয়া গেল
গোপনে ফেলিয়া অশ্রুবারি ,
তাহাদের সব ব্যথা, সব গ্লানি, জ্বালা, অভিশাপ,
পাপ, তাপ, লজ্জা, ভয়, কুণ্ঠা ও ক্রন্দন,
প্রতি ক্ষুদ্র দিবস-রাত্রিব ঘৃণিত জীবন যাত্রা—
কলঙ্ক, হতাশা আর কদর্য্য কলুষ
সযতনে করিয়া চয়ন
এ মোর প্রণামখানি কবিনু বয়ন। (প্রথমা)

'জীবন-বিধাতাকে' বিদ্রোহীর নমস্কার জানিয়েই জনমানসের কবির কর্ত্তব্য ফুরিয়ে যায় না। লক্ষ লক্ষ 'নিঃসম্বল মানবের' হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত না করে তিনি পারেন না। কবি শুনতে পান জনতা আজ জননায়কের আবির্ভাব চায়—যিনি তাদের মুক্তির সন্ধান দেবেন :

দ্বার খোলো হে প্রহরী,
আনো নব ঊষালোক,
সঞ্জীবিত কর আজ নূতন অমৃতে,
নব-সৃষ্টি-গুঞ্জন-মুখর, ধবাতলে জন্ম দাও। (প্রথমা)

নব-সৃষ্টি গুঞ্জন মুখর নূতন ঊষার উদ্বোধন সম্বন্ধে কবি নিঃসন্দেহ।

তাঁব এ-আশা ভাবপ্রবণতা থেকে আসেনি—সমাজ-বিজ্ঞানেব ধারাতেই তাঁর আবেগ ছুটে চলেছে :

যত গ্লানি মানবের হতেছে সঞ্চয়
সেই অশ্রু-প্লাবনের ভাঙ্গন ধাবায
মুছে যাবে কোন দিন।
সেই দিন হ'ব শুচি। (প্রথমা)

অবনত মানুষেব মুক্তির চারণ-গান এখানেই এসে শেষ হ'ল। সমাজ কবিব কাছে এব চেযে বেশি কিছু দাবী করতেও পাবে না। যে পরিকল্পনাকে কবি তাঁর আবেগেব রঙে রঙীন কবে দিয়েছেন তাকে বাস্তবে পরিণত করাব ভাব সমাজ-কর্ম্মীর। কিন্তু ভারতীয সমাজে সে ভাঙা-গড়ার ঢেউ এসে তখন লাগেনি—সামান্য একটু সচেতনতায়, মুক্তির সামান্য একটু ব্যাকুলতায়ই রাষ্ট্রিক বা সামাজিক আন্দোলনের অবসান হয়েছে। সমাজের পক্ষ থেকে এ-নিষ্ক্রিয়তা কবির মনে দ্বন্দ্ব উপস্থিত করতে বাধ্য। মানুষের দুঃখবেদনা, পাপগ্লানিকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলে ধরে নেওয়া ছাড়া তাই আর কোনো পথ তিনি তখন খুঁজে পান নি। মানুষের যদি কেউ বিধাতা থেকে থাকেন, মানুষের ক্ষুদ্রতায়, মানুষের ব্যথাবেদনায় নেমে এসে তাঁর আনন্দময় সত্তা কোনো নূতনতর অনুভূতি সঞ্চয় করে নেন বলে কবি সান্ত্বনা পেতে চান :

মোর সাথে পাপী হলে
বুকে তুলে নিলে মোর তাপ,
মোর সাথে দুর্ব্বহ ব্যথার বোঝা স্কন্ধে নিলে তুলে,
পিশাচ সেজেছ মোর সাথে,
কুটিল, নির্ম্মম, ক্রূর, নৃশংস, নির্দ্দয়। (প্রথমা)

কিন্তু এ সান্ত্বনাতে সমাজসচেতন কবি হয়ত মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে ফেলতে পারেন না। তাই এ-কামনাও তাঁর মনে আসে, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ যেন আজকের দিনের গ্লানি থেকে মুক্ত হতে পারে :

পশ্চাতে আসিছে যারা
তারা যেন ধরণীর এ কলুষ দেখিতে না পায়,
মোদের চোখের জলে শেষ হোক সব তাপ গ্লানি
শেষ হোক মানব-আত্মার এই কাতর কাকুতি
আমাদের বেদনায়। (প্রথমা)

এই বলিষ্ঠ আশাতেই কবি মৃত্যুকে উপেক্ষা করে 'চির-সবুজ জীবন-তরুর' কল্পনাকে নিজের মনে ঠাঁই করে দিয়েছেন। Whitman-এর মতো মৃত্যুর প্রশংসায় স্তোত্র তৈরী করেন নি। প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেন :

মৃত্যুরে কে মনে রাখে ?
—মৃত্যু যায় মুছে।
*　　*　　*
কবরের মৃত্তিকায়, অবহেলি অশ্রদ্ধায়
তৃণে জাগে প্রাণ অবিনাশী। (প্রথমা)

এই প্রাণের স্পন্দন যখন যেখানে থেমে যাচ্ছে—কবি তাতে ব্যথিত হয়ে উঠছেন। নগরীর 'ধূলি-ধূম-ধূম্রজটা-বিভূষিত শিরে' প্রভাতের আশীর্ব্বাদ এসে পৌঁছয় না—'আকাশের সুনীল বিস্ময়' আর রাত্রির রহস্য' সেখান থেকে নির্ব্বাসিত—তাই কবি বলছেন :

যন্ত্রের চক্রান্ত ভাঙি
ভেদ করি ষড়যন্ত্র লৌহে আর লোভে
আসুক প্রভাতখানি,
—সৌম্য-শুচি কুমার সন্ন্যাসী
হে পতিতা তোমার আলয়ে। (প্রথমা)

পৃথিবীকে সুন্দরতম রূপে পেতে চেয়েছেন কবি—তাঁর কামনা পূর্ণ হয়নি, কিন্তু নিজের জীবনে ত তিনি সৌন্দর্য্যের অনেক স্পর্শই পেয়েছেন। তারি জন্যে পৃথিবীর প্রতি তাঁর বিরাট আসক্তি :

ফের যদি ফিরে আসি,
আরো আলো চক্ষে যেন আসি নিয়ে,
বুকে আরো প্রেম যেন আনি
পৃথিবীকে আরো যেন ভালো লাগে। (প্রথমা)

অসুন্দরের ভীড়ে পৃথিবীর সৌন্দর্য্যকে এখন আর তিনি ভুলে থাকতে চাচ্ছেন না। ভীষণের ভীষণতার পাশে সুন্দরের সৌন্দর্য্যকে তাঁর মন স্বীকার করে নিচ্ছে :

বাঁজা ডাঙ্গায় লড়াই বাধে, হাজার দাঁতে কাম্‌ড়ে ছেঁড়ে টুঁটি,
লক্ষ খুনীর খুন চেপেছে, কবন্ধ ধড় খাচ্ছে লুটোপুটি ;
আবার কোথায় নিশীথ রাতে প্রদীপ মিটিমিটি
রুদ্ধনিশাস পড়ছে বধূ প্রিয়তমের চিঠি। (প্রথমা)

সুন্দর-অসুন্দরের পাশাপাশি থাকাই শুধু নয়, পৃথিবীর জীবন-ধারায় কবি লক্ষ্য করেছেন—একদিকে আগুন লেগে আরেক দিক রাঙা হয়ে ওঠে :

আমার মরুর হাহাকারে হিয়া ব্যথা-বিধুর,
তোমাদের দেশে আকাশ হ'ল যে মেঘ-মেদুর
স্নেহ-শীতল !
আমার প্লাবনে তোমাদের তীরে ফলে ফসল। (প্রথমা)

'প্রথমা'র শেষের দিকের কবিতায় আমরা দেখতে পাই কবির দৃষ্টিতে পৃথিবীর দিগন্ত ক্রমেই প্রসারিত হয়ে পড়েছে—সমাজ-উপলব্ধি থেকে মন তাঁর ক্রমেই প্রকৃতি-উপলব্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যৌবনের আগ্নেয় দুর্দ্দান্ততা একটি স্নিগ্ধ, শান্ত শ্রীতে এসে যেন আশ্রয় খুঁজে নিতে চায়। প্রেমেও তাঁর দুরন্ত আবেগের চিহ্ন নেই—সেখানেও তিনি চান শীতলতারই স্পর্শ :

ধূধূ প্রান্তর তোমার প্রণয়ে হ'ল ছোট প্রাঙ্গন ;
দীপ হতে করে, বহ্নি আকিঞ্চন।
তব মমতায় ঘিরে,
অসীম আকাশ-তীরে
সীমার ধরণী গড়ি মোরা অক্ষয়।
তুমি আছ তাই গৃহদীপ সনে তারকারা কথা কয়। (প্রথমা)

যে অখণ্ড সমাজসচেতনতা নিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র কবিতা লিখতে সুরু করেছিলেন—তাতেই যে তিনি বরাবর নিমগ্ন থেকে গেছেন তা নয়। 'প্রথমা'র যুগেই তাঁর সে অপসরণ লক্ষ্য করা যায়। সমাজ থেকে পৃথক করে তিনি যে নিজেকে আবিষ্কার করেছেন 'সম্রাট' কবিতার বই-এ তার চিহ্ন সুস্পষ্ট। বলাবাহুল্য যে মানুষকে ব্যক্তিক ও সামাজিক এই দুই সত্তারই দাবী পূরণ করতে হয়। একটি অপরটিকে গ্রাস করে

বস্‌লে অসুস্থতার আর সীমা থাকে না। সামাজিক সত্তাকে অস্বীকার না করলেও 'সম্রাটে'র কবিতায় কবি ব্যক্তিক সত্তার দাবীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। মানুষ তার নিজের মনের সম্রাট, সামাজিক জীবনের দাবী মিটিয়েও এ সাম্রাজ্য তার অক্ষতই থাকা চাই—সমাজের দাবী যদি এ সাম্রাজ্যে হস্তক্ষেপ করে তাহলে মানুষের বিদ্রোহী মন ক্ষেপে গিয়ে সভ্যতাকে মুছে দিতে উদ্যত হয়।

সমবায়ে সুখ আছে আর আছে শান্তি
. . .
কিন্তু সাম্রাজ্যও যে চাই আমার
* * *
একছত্র অধীশ্বর আমার সাম্রাজ্যের
সে সিংহাসন থেকে আমায় চেওনা হঠাতে
সমবায় সমিতি সেখানে যেন না দেয় হানা,
তাহলেই বাধবে কুরুক্ষেত্র। ('সম্রাট'— সম্রাট)

ব্যক্তিকে স্বীকার করে নিলেও, সামাজিক শক্তিকে তিনি অস্বীকার করেন নি। জনগণের জাগরণ-শক্তিকে তিনি প্রাকৃতিক শক্তির মতোই স্বাভাবিক ও অনিবার্য্য বলে মনে করেন। 'পাঁকে'র অবনত মানব সমাজের কথা তিনি ভোলেন নি—তার জাগরণ যে অবশ্যম্ভাবী এও তিনি জানেন। জানেন, আজকের দিনে যারা সমাজের উঁচু ধাপে প্রতিষ্ঠিত উপরে যাবার তাদের আর কোনো সম্ভাবনা নেই :

চওড়া কাঠের সিঁড়ি গেছে উঠে
ঘুরে ঘুরে অনেক উঁচুতে।

সিঁড়ির একটি বাঁকে
টুলের উপর বসে থাকে সশস্ত্র প্রহরী।
*　　*　　*
আর কাঠের টবে
একটি পামের চারা
*　　*　　*
জানি পামের চারার মধ্যে সঙ্গোপন আছে অরণ্য,
কাঠের টবে একদিন তাকে ধরবে না,
কাঠের টুলে নিঃসঙ্গ জনতা আছে থেমে
স্তব্ধ হয়ে,
একদিন তার স্থাণুত্ব যাবে ঘুচে।
শুধু কাঠের সিঁড়ি
কোনোদিন পৌঁছাবে না আকাশে। ('কাঠের সিঁড়ি'—সম্রাট)

মানুষের নূতন জীবনের জন্য আকুলতা, মানুষের 'প্রভাত-পিপাসা' যে অফুরন্ত—কবি তা উপলব্ধি করতে পারেন। নূতন অবতারণার জন্যে মানুষ বারবার রক্তপাত করেছে—এখনও তা-ই করে চলেছে কিন্তু 'শুভ্র জ্যোতি পবিত্র প্রভাত' আজও দেখা দেয়নি। তাতেও কবি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দেহাকুল নন—তিনি বলেন :

তারপর মন্বন্তর শেষে
জ্যোতিষ্মান অবতার
দেখা দেবে কি নূতন বেশে
—তারই ছবি
ভাবে বসি অভিশপ্ত মানুষের কবি। ('অবতারণা'—সম্রাট)

যে-পথ মানুষের এই শুভ্র ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করে আনছে তাঁর

কল্পনা তাতেই লুব্ধ। যদিও অতীত দিনের মধ্য-এশিয়ার পার্ব্বত্য পথগুলো তাঁকে আকর্ষণ করে—কখনো মধুর অনুভবে ভরিয়ে তোলে হৃদয়, কখনো বা ভয় জাগায়—তবু তাঁর কল্পনা উদ্ভাসিত আরেক পথের উজ্জ্বলতায় :

স্বপ্ন দেখি সে-পথের
অস্তাচল উত্তীর্ণ হয়ে আগামীকালের পানে :
স্বপ্ন যেখানে নির্ভীক,
বৃদ্ধের চোখে শিশুর বিস্ময়,
পৃথিবীতে উদ্দাম দুরন্ত শান্তি। ('পথ'—সম্রাট)

মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই বলিষ্ঠ স্বপ্ন আছে যাঁর চোখে, তিনি মানুষকে দৃঢ়, সবল, প্রাণোচ্ছলই দেখতে চাইবেন। কিন্তু সভ্যতার পোষাক-পরা মানুষের দেহে কোথায় আছে জীবনের দুরন্ত ভঙ্গী? নেই। এমন কি নগরের খাঁচায় পুষে বাঘের চোখ থেকেও আমরা তার অরণ্য-জীবনের দুর্দ্ধর্ষ জীবন সংগ্রামের উজ্জলতা মুছে ফেলেছি। অরণ্য-জীবনে জীবনের উদ্দামতা তীব্র, হিংসা সেখানে প্রখর, উজ্জ্বল, আর তাই মৃত্যুও রঙীন স্বাদে পরিপূর্ণ। আমাদের জীবনে হিংসা আছে, মৃত্যু আছে কিন্তু তা স্বাদহীন। এখানে

... ..হিংসা বর্ণহীন ক্ষুধা
বন্যার প্রবাহ-চক্রে মৃত্যু শুধু দ্বার। ('বাঘের কপিশ চোখে'—সম্রাট)

নগরের প্রাচীর আর শৃঙ্খল আমাদের চেতনাকে যখন স্থবির করে দিয়েছে—জীবনের প্রাণাবেগ বা মৃত্যুর আনন্দ আমরা পাব কি করে? মৃত্যুর রোমাঞ্চকর স্পর্শ এমন কি সৈনিকের জীবনেও আছে। সৈনিকেরা যা জানে আমরা তা জানিনে :

শব আর মানুষের মাঝখানে
জানি নাই কম্পিত মুহূর্ত্ত
একটি স্বপন নাই
মৃত্যুর নগ্নতা ঢাকিবার। ('আমরা যাইনি যুদ্ধে'—সম্রাট)

জীবনের আনন্দকে মৃত্যুর অসহ্য আনন্দে মিশিয়ে দেবার শক্তি আছে আফ্রিকার আরণ্য মানুষের। রমণীর দেহ থেকে জীবন যে আনন্দের অনুভূতি পায় তাতে যেমন আছে জীবনের উপর ক্ষয়ের বা মৃত্যুর স্পর্শ—যেমন ছোট ছোট মৃত্যু দিয়ে আমাদের আনন্দগুলো তৈরী—তেম্নি মৃত্যুর সম্পূর্ণতায় রযে গেছে আনন্দের সম্পূর্ণতা। তাই আফ্রিকার মানুষের কণ্ঠে শোনা যায় :

মৃত্যুর মৌতাতে বুঁদ হয়ে গেছি সব
রমণী ও মরণেতে ভেদ নাই। ('নীলকণ্ঠ'—সম্রাট)

মৃত্যুর এই যে আনন্দ বা আনন্দেরই যে ঘনীভূত রূপ মৃত্যু—রুগ্ন, ফ্যাকাশে সভ্যতা তা উপলব্ধি করতে পারে না :

আমাদেব জীবনে নেই জ্বলন্ত মৃত্যু,
সমুদ্র-নীল মৃত্যু পলিনেসিয়ার
আফ্রিকাব সিংহ-হিংস্র মৃত্যু। ('নীলকণ্ঠ'—সম্রাট)

স্তিমিত দীর্ঘ পরমায়ুর সাধনা করে সভ্যতাকে সুস্থ বা সার্থক করা যায় না। রুগ্ন হযে পড়েছে যে-সভ্যতা তার রক্তের সঙ্গে 'মৃত্যু-মাতাল' রক্তের বিনিময় করতে হবে। জীবনে আন্‌তে হবে 'ঝাঁঝালো মৃত্যুর স্বাদ'। আদি প্রাণী 'অ্যামিবা'র মৃত্যু নেই—কিন্তু প্রাণের বিবর্ত্তনে অমরতার ঠাঁই কোথায়? বিবর্ত্তনের পথে প্রাণ মৃত্যুকেই শ্রেয় জ্ঞানে আবিষ্কার করেছে। কল্যাণের দেবতা আমাদের তাই মৃত্যু পান করেছেন :

'অ্যামিবারও ত' মৃত্যু নেই।
মৃত্যু জীবনের শেষ সার আবিষ্কার
আর
শিব নীলকণ্ঠ ! ('নীলকণ্ঠ'—সম্রাট) *

মৃত্যুর বাস্তবদিকের একটি সুন্দর মানে আবিষ্কার করেও কবি মৃত্যুর কোনো স্থায়ী মূল্য আবিষ্কার করতে পারেন না। 'মৃত্যুরে কে মনে রাখে ?'—একথার ধ্বনিই কবির কানে বেজে চলেছে। মৃত্যুই মানুষের সীমান্ত নয়। মৃত্যুর সীমা পার হয়ে উড়তে থাকে পাখীর মতো মানুষের স্বপ্ন আর আশা। তারা

.....চলে বিরামহীন
কুলহীন সাগরে সাগরে
যুগান্তর হতে যুগান্তরে
নভোসীমা করিয়া বিস্তার। ('মৃত্যুত্তীর্ণ'—সম্রাট)

---

* মানুষের মৃত্যু সম্বন্ধে কবির এই ধারণা একটি বৈজ্ঞানিক মতবাদেরই অনুরূপ। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি মানুষের একটি মৃত্যুবৃত্তি আবিষ্কার করে পতঙ্গের প্রদীপ-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তার তুলনা করেছেন। মৃত্যুর অবস্থায় বা জড় প্রাণহীনতায় ফিরে যাবার জন্যে প্রাণীর এই বৃত্তিকে সিগমুণ্ড ফ্রয়েডও সত্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন যে মৃত্যুর আবেগ প্রাণীর পক্ষে স্বাভাবিক ও শাশ্বত। তাঁর যুক্তিটা এরকম : যদি কোনো ধারণাতীত দিনে কল্পনাতীত উপায়ে জড়পদার্থ থেকে প্রাণের উদ্ভব হয়ে থাকে তাহলে বলা যায় যে প্রাণের সঙ্গে সেদিন এমন একটি বৃত্তিরও জন্ম হয়েছিল যার উদ্দেশ্যই প্রাণকে নষ্ট করে আবার জড়পদার্থে ফিরে যাওয়া। এই মতবাদ নিয়ে ফ্রয়েড বলেন যে মানুষের যৌন আবেগও মৃত্যুরই একটা পথ। কবিও বলছেন : "মৃত্যুর মৌতাতে বুঁদ হয়ে গেছি সব—রমণী ও মরণেতে ভেদ নাই।"

মুক্তির প্রতি আসক্তি প্রেমেন্দ্র মিত্রের মনের একটি উজ্জ্বল রঙ। প্রথমার যুগের মুক্তির মূল অনুভূতিকে তিনি মন থেকে কখনো নির্ব্বাসিত করেন নি। মানুষের স্বপ্ন আকাশের পরিচিত বেষ্টনীতে আবদ্ধ হয়ে থাকে না -ক্রমেই সে-স্বপ্নের কাছে আকাশ তার সীমা বাড়িয়ে চলে। স্বপ্নের এই অবাধ উড়ন্ততায় কবি মুগ্ধ—যেম্নি সাগর পাখীর উড়ে যাওয়ায় তিনি মুগ্ধ ঃ

সাগর পাখীরা উড়ে চলে তাই,
আকাশের কোনোখানে সীমা নাই। ('সাগর পাখীরা'—সম্রাট)

সাগর পাখীর অবাধ অভিযানের পিপাসা মানুষের সচকিত ভাবনাময় জীবন থেকে মুছে গেছে বলে কবি ব্যথিত। আমাদের ভাবনাগুলো বাদুড়ের কালো পাখা মেলে দেয় ঃ

সিন্ধু সারস হাষ
তাব মাঝে নাই কোনো
জানো না অতল লোনা স্বাদ
আজ বাতে সাগবের শুন্‌তে পাবে না ডাক—
হৃদয়ের কোন দূর তটে। ('আজ রাতে'—সম্রাট)

আমাদের মুক্ত জীবনের পায়ে যে শৃঙ্খল জড়িয়ে আছে—তার জন্য কবি ব্যথিত হয়েছেন বটে কিন্তু অসুস্থতায় নিমগ্ন হয়ে যাননি। মুক্তির ক্ষণটুকুকে উপভোগ করবার মতো মন তিনি সর্ব্বদাই খোলা রেখেছেন। ক্ষেত থেকে ফসল তুলে আনবার ভাবনাহীন আনন্দময় ক্ষণের স্তোত্র রচনা করতে মন তাঁর ব্যাকুল হয়ে ওঠে--যদিও তিনি জানেন ঃ

কাল পৃথিবীতে ব্যস্ততা জাগ্‌বে শস্য বহনের আর বিতরণের
আর হায়, লোভের সংগ্রাম। ('শস্য-প্রশস্তি'--সম্রাট)

কিন্তু আজ ত শান্তি। আজ ত তিনি ভাবতে পারেন :

মাঠের শস্য গৃহে এল,
এল মানবের শক্তি ও যৌবন,
এল নারীর রূপ ও করুণা,
পুরুষের পৌরুষ,
ভবিষ্যৎ মানব-যাত্রীর পাথেয়। ('শস্য-প্রশস্তি'—সম্রাট)

সামাজিক বিচারে এ আনন্দের ক্ষণটি হয়ত মিথ্যা—কবিও তা জানেন—কিন্তু মিথ্যার আঘাতে স্বপ্নক্ষণটিকে তিনি বিস্বাদ করে তুল্‌তে চান না :

জীবন-শিয়রে বসি স্বপ্ন দেয় দোল,
ওরে ব্যর্থ ব্যথাতুর
সে মিথ্যায় মত্ত হয়ে সত্য তোর ভোল। (প্রথমা)

কবি-মনের ধর্ম্ম প্রেমেন্দ্র মিত্রের চোখ থেকে কঠোর সত্যকে আড়াল করে রাখতে চেয়েছে। বিংশ শতকীয় কবিদের দুর্ভাগ্য যে বিজ্ঞানের সঙ্গে সুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁরা শেলির মতো রোমান্টিসিজমের পথে কবিতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন নি। কেননা শেলির যুগের বিজ্ঞান আজ অনেক দূরে এসে পড়েছে—কবি-মনের সঙ্গে বিরোধ এখন তার পদে পদে। বিজ্ঞানের দিকে চোখ বুঁজে থাক্‌লে তবু কোনো রকমে কবিদের চলে যায় কিন্তু বিজ্ঞানের প্রতি উৎসুক যে-কবির মন লরেন্সের মতো তিনি বিজ্ঞানের কঠোর সত্য থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে আনতে বাধ্য। যে অনুভূতিগুলোকে নিয়ে কবি স্বপ্ন রচনা করেন, যাদের আঘাতে হৃদয় তাঁর আনন্দে-বেদনায় উচ্ছল হয়ে ওঠে, তাকে যদি বিজ্ঞান ইলেক্ট্রনের ভাষায় প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে দিতে চায় তখন কবি বলেন :

আমার থাক
সমস্ত অঙ্কের এ পিঠে
মিথ্যা মরীচিকার এই ব্যঙ্গ,
নেশার রঙে টলমল
এই মুহূর্ত্ত-বুদ্বুদ,
জন্ম, মৃত্যু, প্রেম,
আনন্দ, বেদনা আর নিষ্ফল এই
আত্মার আকুতি। ('তামান্না'—সম্রাট)

ইলেক্ট্রনের গাণিতিক গদ্য এড়িয়ে কবির স্পর্শকাতর মন জীবনের অনুভূতিগুলোকে নিয়েই সজাগ থাকতে চায়। হঠাৎ মনে হতে পারে যে এখানে তিনি সাধারণ মানুষের অনুভূতির স্তরে এসেই দাঁড়ালেন। 'প্রথমা'র কবি সম্বন্ধে হয়ত এ কথা উচ্চারণ করা খানিকটা সম্ভব ছিল, যদিও সেখানে তিনি সাধারণ মানুষকে জড়িয়ে গড়ে উঠলেও অনুভূতির ক্ষেত্রে অসাধারণই রয়ে গেছেন। সাধারণ মানুষকে যে বলিষ্ঠ সচেতনতার স্তরে নিয়ে উপস্থিত করানো যায় সে-মনোভাব নিয়েই 'প্রথমা'র কবিতা-গুলো তৈরী হয়েছে। 'সম্রাটে'র কবি অসংশয়ে স্বাধীন, মুক্ত মনের প্রতীক। তাঁর মনের স্পর্শকাতরতা এখানে সাধারণের মনের চেয়ে ঢের বেশি বিচিত্র ও সূক্ষ্ম ধারায় প্রবাহিত। নগরের জটিল জীবনে, কাজের ভীড়ে যদি তিনি হাওয়ায় কোমলতার স্পর্শ পান, তাঁর মনে হয় কোন্ দূর বনে বুঝি বৃষ্টি হয়ে গেছে—তারি স্মৃতির সৌরভ এসে মিশেছে এখানে :

মনে পড়ে মনে পড়ে
কোথায় অরণ্য ছিল
সুবিশাল, গহন, গভীর .

সোনালী রোদের সুরা
পান করে ধরণীর
প্রসারিত সবুজ রসনা। ('কোন্ দূর বনে'—সম্রাট)

তেম্নি বিনিদ্র রাত্রির অন্ধকারে তিনি অনুভব করেন পৃথিবীর অতীত সভ্যতার স্মৃতির ঢেউ। সময়ের পদধ্বনি শুন্‌তে পান তিনি, যে-সময় অতীতের অনেক চিহ্ন মুছে দিয়ে গেছে :

স্পন্দিত হৃদয়ে
সময়ের পদশব্দ শুনি,
অবিরাম অশ্রুব ধ্বনি
কাল-প্রহরীর।
—কতদূর হতে আসে
নিভায়ে নিভায়ে
কত ক্লান্ত সভ্যতার দীপ,
কত পথ মুছে মুছে,
চির-মৌন হিমরাত্রি বিছায়ে বিছায়ে,
সৃষ্টির ফসল-তোলা নিঃশেষিত নক্ষত্রের প্রান্তরে প্রান্তরে। ('বিনিদ্র'—সম্রাট)

প্রেম সম্বন্ধেও কবির অনুভূতি এম্নি গভীরে চলে গেছে। গাছ যেমন বসন্তকে ভুল্‌তে পারে না কোনোদিন চিরদিনই গাছের পক্ষে বসন্ত নূতন—তেম্নি প্রেমও কবির মনে পুরোনো নয় কোনোদিন ('পুরাতন নাম' —সম্রাট)। পৃথিবী বদ্‌লে গেছে অনেকবার কিন্তু 'পুরাতন পর্ব্বতের, সাগরের, অরণ্যের বীজ' অঙ্কুর মেলে চলেছে—এই সৃষ্টির পথ ছাড়িয়ে প্রেমও যেতে পারে না ('পুরাতন বীজ'—সম্রাট)। 'প্রথমা'য় কবি প্রেমের কাছে নিজেকে সঙ্কুচিত করে এনেছিলেন—এখানে তিনি প্রেমকে তুলে এনেছেন বন্ধনমুক্ত মনের স্তরে, আবেগের সীমাহীন প্রসারিত ক্ষেত্রে :

দিগন্ত-পিপাসা যদি
কিছুতে না মেটে, তবে
এস খুজি দুজনার চোখে 'জাহাজের ডাক'—সম্রাট)

কূলহীন সমুদ্র
দিগন্তহীন আকাশ
তুমি ত আমার সেই 'সৌরভ'—সম্রাট)

তুমি আমার অরণ্য
আমার ঝঞ্ঝাবেগের
প্রশ্রয় ও প্রতিবিম্ব। ('ঝড় যেমন করে জানে অরণ্যকে'—সম্রাট)

তোমার নয়ন হতে
আজিকার নীল দিন
জীবনের দিগন্তে ছড়ায়। ('নীল দিন'—সম্রাট)

'প্রথমা'র কবি 'সম্রাটে' জনতার জীবন থেকে পৃথক হয়ে এসেছেন সত্যি—"জীবনের যে ভূভাগে মরুর অধিকার পাকা হয়নি, যেখানে ফুল ফোটে ফল ফলে, সেখানেও কবি বাঁশী বাজাবার বাসনা পেয়েছে এ কথা মনে রেখো—কেবলি দুন্দুভি বাজাবার পালা তার নয়"—'প্রথমা'র কবির প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি 'সম্রাটে'র কবিতাগুলোতে প্রতিধ্বনিত হযত হচ্ছে—কিন্তু তবু আমরা বলব যে প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর প্রাথমিক অনুভুতিগুলোকে অচেতনতায ডুবিয়ে দেননি। মানুষের মুক্তির বা মানুষের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন তাঁর চোখ থেকে বিলীন হয়নি —'প্রথমা'য় যে-বাণী ছিল তাঁর কণ্ঠে সোচ্চার, তা অন্তর্মুখী হয়ে হৃদয়ের অতলে আশ্রয় নিয়েছে—তার লাবণ্যময় স্ফুরণ ক্ষণে ক্ষণে আমরা দেখতে পাই। চারণ-কবি গভীর অনুভূতিশীল কবি হয়ে উঠেছেন। এ তাঁর

সত্যিকারের অপসরণ নয়—সংহত, গাঢ় আবেগে নিবিড়-হয়ে-ওঠা। 'সম্রাটে'র পরেকার অগ্রন্থিত কবিতাগুলো থেকেও একটি কবিতা যদি আমরা স্মরণ করি তাতে দেখব যে মানুষের স্তিমিত প্রাণহীন জীবন-ধারণের প্রতি কবির বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই—তাঁর ধারণা প্রকৃতি মানুষের জীবনে যে-ইঙ্গিত বহন করে তা শুধু বাঁশী বাজাবার প্রেরণাই দেয় না, দেয় পৌরুষ দেখাবার প্রবর্ত্তনা। বাংলা দেশ নিয়ে তাঁর কবিতায় আমরা পাই :

উত্তরে উত্তুঙ্গ গিরি
দক্ষিণেতে দুরন্ত সাগর
যে দারুণ দেবতার বর
মাঠ ভরা ধান দিয়ে শুধু
গান দিয়ে নিরাপদ খেয়া তরণীর
পরিতৃপ্ত জীবনের ধন্যবাদ দিয়ে
তারে কভু তুষ্ট করা যায় !

ছবির মতন গ্রাম
স্বপনের মতন শহর
যত পারো গড়ো
অর্চ্চনার চূড়া তুলে ধরো
তারাদের পানে ;
তবু জেনো আরো এক মৃত্যু-দীপ্ত মানে
ছিল এই ভূখণ্ডের,
—ছিল সেই সাগরের পাহাড়ের দেবতার মনে
('ভৌগোলিক'—নিরুক্ত)

এই মৃত্যু-দীপ্ত জীবনের কবি আজও অম্লান।

বুদ্ধদেব বসু

'কল্লোল' আর 'প্রগতি'র যুগে যে একদল শক্তিশালী তরুণ লেখক বাংলা সাহিত্যে একটা নূতন আবহাওয়া তৈরী করে তুলেছিলেন তাকে আধুনিক অনেক সমালোচকই রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতিক্রিয়া বলে ঘোষণা করে থাকেন। সাহিত্যের প্রতিক্রিয়ায় খাঁটি সাহিত্য তৈরী হতে পারে না, জীবন উপলব্ধি থেকেই তার জন্ম হয়; কোনো বিশেষ ধরণের সাহিত্যের অনুকরণ বা বিরোধিতা থেকে যে সব মূল্যহীন রচনা জন্ম নেয় সাহিত্যের ইতিহাসে তা দিয়ে একটা অধ্যায় তৈরী হয় না। 'কল্লোল' বা 'প্রগতি'র সাহিত্য-আন্দোলন বাংলা সাহিত্যে একটি অধ্যায় তৈরী করেছে; সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের দিকে তাকিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে সে-আন্দোলন মূল্যহীন বা বিফল নয়। এতটা প্রভাব বিস্তার করবার মতো জীবন্ততা নিয়ে যে সাহিত্যের আবির্ভাব হয়েছিল তার প্রেরণার উৎস জীবন-বোধ ছাড়া আর কিছু হতে পারে বলে আমরা মনে করিনে।

জীবনকে রবীন্দ্রনাথ যে চোখে দেখেছেন বা যে ভাবে পেয়েছেন, যুদ্ধোত্তর যুগের তরুণদের কাছে জীবনের চেহারা ঠিক তেমন ছিল না। একটু অন্যরকম চেহারায়, একটু অন্যধরণের মানে নিয়ে জীবন এসে তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে। সে-জীবনকেই তাঁরা রূপায়িত করতে চেয়েছেন সাহিত্যে। সৃষ্টিবাদই তাঁদের সাহিত্য-ধর্ম্ম ছিল, তবে নূতন সৃষ্টিতে ধ্বংসের যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু-কে প্রশ্রয় না দিয়ে তাঁরা পারেন নি। এই সৃষ্টির ইচ্ছা সবচেয়ে স্বচ্ছ হয়ে উঠতে পেরেছে

তখনকার দিনের কাব্য-সাহিত্যে —যেহেতু নেতিধর্ম্ম নিয়ে কথাসাহিত্যের কারবার কিছুটা চললেও কাব্য-সাহিত্য তা নিয়ে বাঁচতে পারে না—কবিতার কাছে হৃদয় আঁকড়ে ধরবার মতো কিছু পেতে চায়।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের তখনকার দিনের কবিতায় যে-জীবনের মূর্ত্তি ভেসে উঠেছে তা এক বিরাট সামাজিক জীবন: এ জীবন আমাদের চোখের উপর সব সময় ভেসে থেকেও কাব্যে কখনও প্রবেশ পত্র পায়নি। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু গ্রহণ করেছিলেন ব্যক্তিরই জীবন, যা ছিল রবীন্দ্রনাথেরও কবিতার উপাদান; অথচ সে ব্যক্তির জীবনের দিকে বুদ্ধদেব বসু তাকিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক দৃষ্টি নিয়ে। মানুষের জীবনে সুন্দরের দাবীই কায়েম হয়ে থাকতে পারে না, অসুন্দরের দাবীও মানুষকে সমান ভাবে মেটাতে হয়। আলডুস হাক্সলি একেই বলেছেন ডক্টর জিকিলের আর মিষ্টার হাইডের দাবী, বলেছেন—আধুনিক জগতে সুস্থভাবে বাঁচবার উপায় এই দুই দাবীর সমন্বয় করা। মিষ্টার হাইডের বা অসুন্দরের দাবীর কথা রবীন্দ্রকাব্যে উহ্য থেকে গেছে। রবীন্দ্রকাব্যের আবেগ নির্দ্দোষ, পরিশীলিত এবং অনেক সময় আধ্যাত্মিক, তার উদ্ভব স্থূল রক্তমাংস থেকে নয়—মনের সূক্ষ্মতা থেকে। দেহের স্বাভাবিক কামনার কাহিনীগুলোকে অন্তরালে রেখে উনিশ শতকের ভদ্র, শালীন (মতান্তরে অপলাপী) সামাজিক জীবনেরই ঋণশোধ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর সমাজ, এমন কি বাঙালীর সমাজও, জীবনের এরকম প্রকাশ-ভঙ্গীকে সত্যের অপলাপ বলে মনে করেছে। জীবনের সবগুলো দিক অকপটে স্বীকার করে নেওয়ার নামই আধুনিকতা। বুদ্ধদেব বসুর প্রথম

কবিতার বই 'বন্দীর বন্দনা' এই আধুনিকতার নির্ভীক বন্দনার জন্যেই স্মরণীয়।

'বন্দীর বন্দনা'য় আমরা দেখতে পাই একটি কবির জন্ম হচ্ছে: কবি জীবনের কলুষিত কদর্য্যতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছেন: কুৎসিত পারিপার্শ্বিকে নিজের পাশব সত্তার মুখোমুখি হয়ে তিনি দাঁড়িয়েছেন:

আমি শুষ্ক নিশাচর, অন্ধকারে মোর সিংহাসন,
আমি হিংস্র, দুরন্ত, পাশব।
সুন্দর ফিরিয়া যায় অপমানে, অসহ্য লজ্জায়
হেরি মোর রুদ্ধদ্বার, অন্ধকার মন্দির প্রাঙ্গণ। (শাপভ্রষ্ট, বন্দীর বন্দনা)

জীবনের এই বিফলতা—এই পরিচয়ই জীবনের সবটুকু নয়, বিশেষ করে কোনো কবির মনে। প্রাণধারণের পথে নিষ্ঠুরতার অত্যাচারকে বা জৈবিক কামনার দংশনকে স্বীকার করে নিলেও সেখানেই কবি বন্দী হয়ে থাকতে পারেন না, আবিষ্কার করে নিতে হয় তাঁকে সুন্দরের জগত, যেখানে আছে তাঁর মনের অবাধ, অগাধ প্রশ্রয়। প্রকৃতি-সম্ভোগে কবি মনের সেই মুক্তি খুঁজে নিয়েছেন, নিজের সত্তাকেও তখন তাঁর মনে হয়েছে মহীয়ান:

সুধায় নির্ম্মিত মোর দেহ-সৌধখানি
ইন্দ্রিয় তাহার বাতায়ন
মুক্তকরে রাখি তারে আকাশের অকূল আলোকে। (শাপভ্রষ্ট—ব, ব)

তাছাড়া প্রেমের স্পর্শেও কবি নিজেকে শাপভ্রষ্ট দেবতা বলে আবিষ্কার করবার সুযোগ লাভ করেছেন:

যার স্পর্শে ক্ষণে-ক্ষণে হৃদয়ের বেদনার মেঘে
চমকিয়া খেলি যার হর্ষের বিজলী ;—
নেত্রের মুকুরে তার দেখেছি আপন প্রতিচ্ছবি,
দেখিয়াছি কান্তি মম দেবতার মতো অপরূপ। (শাপভ্রষ্ট—ব, ব)

কবির মন আর প্রেমিকের মন নিয়ে কবি কদর্য্যতার জগৎ থেকে বেঁচে উঠছেন—'বন্দীর বন্দনা'র প্রথম কবিতা 'শাপভ্রষ্টে' সেই বাঁচার ইতিহাসই আমরা দেখতে পাই। প্রেম আর কবিতা কবির নিজস্ব সৃষ্টি—তার জন্যে প্রকৃতির কাছে হাত পাততে হয় না তাঁকে। প্রকৃতির কাছ থেকে মানুষ যতটুকু পায়, তা খুব মহৎ নয়, পশুর পাওয়ার চেয়ে বেশী নয়—মানুষ নিজেকে নিজে মহৎ করে তোলে—'বন্দীর বন্দনা' কবিতায় কবি সে কথাই ব্যক্ত করেছেন।

প্রেম-প্রতিভা এবং কবিতা রচনার শক্তি—এ দুটোকেই বুদ্ধদেব বসু জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসেবে আবিষ্কার করে নিয়েছেন। কবিতা রচনা করবার শক্তি সম্বন্ধে তিনি কেবল সচেতনই নন, অত্যন্ত প্রবলভাবে আবেগময়—('কোনো বন্ধুর প্রতি'—ব-ব)। যৌবনে কবিতা রচনার মূলে অবশ্য প্রেমের উৎসাহ-ই থাকে সবচেয়ে বেশি। ভাষাময় আবেগেকেই যদি আমরা কবিতার সংজ্ঞা বলে ধরে নিই, তাহলে যৌবনের কবিতা অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই প্রেমের কবিতা হবে—কেননা প্রেমের আবেগই যৌবনকে আন্দোলিত করে সবচেয়ে বেশি। যৌবনের কবিদের কবিতার পেছনে যে একটি নারীর প্রেম কাজ করতে থাকে সে ঘটনার অকপট স্বীকারোক্তি অচিন্ত্যকুমারের একটি কবিতার পংক্তিতে পাওয়া যায়: "কার কবিতার উৎসের মূলে তুমি

চির-উৎসাহ ?”—(অমাবস্যা)। প্রেমের আবেগই যে কবিতার প্রেরণা দিচ্ছে বুদ্ধদেব বসুও তা অকপটে স্বীকার করে যাচ্ছেন। তিনি বলছেন তাঁর কবিতা পাঠকের জন্যে নয়, বর্ত্তমানের বন্ধুদেব জন্য নয়, ভবিষ্যতেব ‘সপ্তাদশী’ব জন্যেও নয়—

তবু যে জাগিছে আজি সঙ্গীতরঙ্গভঙ্গ হৃদয়েব হিম-সরোবরে
সে শুধু তোমাবি লাগি—(‘আব কিছু নাহি সাধ’—ব, ব)

তাই প্রেমই বুদ্ধদেব বসুর মনে ধর্ম্ম হয়ে উঠেছে। প্রেমের ভেতর কোথাও তিনি সামান্যতম গ্লানি খুঁজে পাননি—যেমন পেয়েছেন অচিন্ত্যকুমার বা জীবনানন্দ দাশ। ক্ষণিক প্রেমের জয়গান করতেও তাঁর মনে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নেই—(‘ক্ষণিকা’, ‘মৈত্রেয়ীর প্রত্যাখান’—ব-ব) এমন কি প্রেমহীন প্রেমের অভিনয়কেও তিনি সহ্য কবতে রাজী—(‘অমিতার প্রেম’—ব-ব)। একথা অসংশয়েই বলা যায় যে বুদ্ধদেব বসুব মতো প্রেমধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান কবি বাংলা কাব্য-সাহিত্যে আজ পর্য্যন্ত আর কেউ আসেন নি।

বুদ্ধদেব বসুর পরবর্ত্তী কাব্যগ্রন্থ ‘কঙ্কাবতী’তে তাঁব যে পরিণত ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় তা শুধু কবিতাব আঙ্গিকে, ভাষায় অথবা কল্পনার সুচারতায়—বিষয়বস্তুব নূতনত্বে নয়। সেখানেও প্রেমধর্ম্মিতায় তিনি নিষ্ঠাবান। ‘কঙ্কাবতী’র পঁচিশটি কবিতাব প্রায় প্রত্যেকটিই প্রেমের আবেগ থেকে রূপ পরিগ্রহ কবেছে। সে-আবেগ যে সব সময়ই আবর্ত্তের মতো হৃদয়ের মূলগত তা নয় ক্ষণিকের রঙীন হাল্কা বুদ্বুদের মতোই বরং তা ক্ষণে ক্ষণে হৃদয়ের উপর ভেসে উঠেছে।

পৃথিবীর ব্যস্ত, কোলাহলময় জীবনকে অসহ্য মনে করে স্বাভাবিক ভাবেই রোমান্টিক কবিরা একটি অনুভূতির জগৎ তৈরী করে নেন। ইংরেজি কবিতায় বহু যুগ থেকে এ ধরণের সৃষ্টি আরম্ভ হয়ে ইয়েটস্ এবং ডি লা মেয়ারে এসে তা শেষ হয়েছে। বাংলা কবিতায় জীবনানন্দ দাশ এধরণের সৃষ্টিতে সার্থক। বুদ্ধদেব বসু রোমান্টিক কিন্তু ব্যস্ত, কোলাহলময় জীবনকে তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি—বরং তাকে সহ্য করেই নিয়েছেন :

ব্যস্ত এ-পৃথিবী আছে মোর তরে আজিকার মতো ;
পৃথিবী-মানুষে ভরা, মোর'পরে সকলের দাবি—
পৃথিবী—কাজের কল, মোর'পরে সবগুলি চাকা
এই নিয়ে কাটে মোর আজ।—('কখনো'—কঙ্কাবতী)

এই পৃথিবীর প্রভাব তাঁর রোমান্টিক মনকে প্রভাবিত করে' অনেক সময় বাস্তবের মুখোমুখি করে দিয়েছে। এই বাস্তবতার স্পর্শে তিনি মনস্তাত্ত্বিক হবার সুযোগ পেয়েছেন—বিষণ্ণ দার্শনিকতার পথে পা' বাড়ানানি। বনলতা সেনের চুল দেখে জীবনানন্দের হৃদয় একটি হারাণো জগৎকেই স্মরণ করে : "চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা।"—চুল নিয়ে তাঁর মনে কোনো রকম ইচ্ছা জাগে না ; বুদ্ধদেব বসু একটি মেয়ের চুলকে 'একমুঠো জমানো আঁধার' বা 'নিশীথের মেঘের মতো' বলেই চুপ করে থাকেন না, তারপর তাঁর ইচ্ছাকে ভাষা দেন :

দন্তাগ্রে কেশের গুচ্ছ, কাটি তারে তৃণের মতন,
উরজ পুষ্পের মত চুল ছানি দুই হাত দিয়ে ;
—খস্‌খসে চুলগুলি, তার স্পর্শে নাসিকা স্ফুরিছে,
চুলগুলি পান করে মোর উষ্ণ, সতৃষ্ণ নিঃশ্বাস।—('চুল'—কঙ্কাবতী)

বুদ্ধদেব বসুর ইচ্ছা ব্যবহারিক জীবনের রং দিয়ে তৈরী, কিন্তু কবিতা রচনায় এ-ইচ্ছা-ই তাঁর একমাত্র অবলম্বন নয়, সত্যেন দত্তীয় যুগে কিরণধনের যা ছিল। এ-ইচ্ছার সঙ্গে রোমান্টিক মনের আবেগের রং-ও প্রচুর এসে মিশেছে। ইচ্ছা আর আবেগ নিয়েই বুদ্ধদেব বসুর কবিতা স্বতন্ত্র, অভিনব।

হৃদয়ের দুটো পুরোণো সম্পদ—কবিতা আর প্রেম—'কঙ্কাবতী'র যুগে এসে বুদ্ধদেব বসু হারিয়ে বসেননি—ববং এখানে তা আরো পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। কবি একা-একা কথা বলেন, 'হৃদয়ে ফুলের মতো' কবিতা ফুটে ওঠে, আকাশের তারার মতো আর সমুদ্রের ঢেউএর মতো তা'রা অসংখ্য, অজস্র :

যে-আকাশে তা'রা তারা—যে-সমুদ্রে ঢেউ
সে-আকাশ আমার হৃদয়,
সে-সমুদ্র আমার হৃদয়। —('কবি'— কঙ্কাবতী)

তেম্নি মনে-মনে কথা বলেন কবি, যার কাছে কথা বলেন সে আকাশে ঘুমিয়ে আছে আর সমুদ্রের সঙ্গে মিশে আছে :

যে-আকাশে, যে-সমুদ্রে আছে সে ঘুমায়ে
সে-আকাশ আমার হৃদয়,
সে-সমুদ্র আমার হৃদয়।—('কবি'—কঙ্কাবতী)

এ-কবিকে রোমান্টিকতার কষ্টিপাথরে যাচাই করে খাঁটি বলে ঘোষণা করা যায়—মনে করা যায় যে তিনি মানসিক ইচ্ছার তরলতা থেকে ছুটি নিয়ে গাঢ় আবেগময়তায় নেমে আস্‌ছেন। 'সুখান্বেষী', 'কোনো মেয়ের প্রতি', 'অন্য কোনো মেয়ের প্রতি', 'আমার কবিতা' (রমাকে),

'আমন্ত্রণ রমাকে'—কবিতায় যে মানসিক ইচ্ছার রূপ ফুটে উঠেছে তা সব ভুলে গিয়ে এ-কবি যে বিশুদ্ধ আবেগ পরিবেশনে দক্ষ হবেন তাতে আর সন্দেহের অবকাশ থাকেনা। আর সত্যি 'আরশি', 'সেরিনাড' 'কঙ্কাবতী'. 'মধ্য-রাত্রে', 'রূপকথা', 'শেষের রাত্রি' কবিতায় তিনি যে মত্ত আবেগময়তার পরিচয় দিয়েছেন তা প্রায় ঊনিশ শতকীয় রোমান্টিক ইংরেজ কবিদের পর্য্যায়ের। এমন কি এসব কবিতার আঙ্গিকও এ ধরণের ইংরেজি কবিতার আঙ্গিক স্পর্শ করেছে; উদাহরণত বলা যায় যে 'সেরিনাডে'র আঙ্গিক টেনিসনের "The Ballad of Oriana'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও এ ধরণের কবিতাগুলো বাংলা কবিতারই নিজস্ব ধ্বনিতে ধ্বনিময়। এই ধ্বনিময়তার সম্ভাবনা যে বাংলা কবিতায় ছিল 'কঙ্কাবতী' পর্য্যায়ের কবিতাগুলোর আগে তা আমরা জানতে পারিনি। আবেগেরও এতো অসহ্য উচ্ছলতা এর আগে আর কোথাও দেখা যায় নি—প্রেমের অনুভূতিতে নজরুল ইস্‌লামের আবেগও এতোটা তীক্ষ্ণ নয়ঃ

প্রতি মুহূর্ত্ত ফুটে ঝরে যায়, ফেটে মরে যায় ফুলের মতো,
ফুটে ঝরে যায় তোমার নামে;
রাতের ঘুমের প্রতি মুহূর্ত্ত সুখে ফুটে ওঠে তোমার নামে,
প্রতিমুহূর্ত্ত তোমার নামের শব্দে ফোটে;
কাজের জোয়ারে, ঘুমের সময়ে তোমার নামের শব্দ রটে—
কঙ্কা—কঙ্কা—কঙ্কাবতী!
কঙ্কাবতী গো!—('কঙ্কাবতী'—কঙ্কাবতী)

কতগুলো শব্দের আর কথার পুনরাবৃত্তি করে আবেগের স্রোতকে ভাষায় রূপায়িত কবে তোলা বুদ্ধদেব বসুর নিজস্ব সার্থক আবিষ্কার। এ যেন অনেকটা চকমকি ঠুকে ঠুকে আগুন জ্বালানো। বাংলা ভাষার স্বাভাবিক জড়তাকে নিয়ে আবেগের স্রোত তৈরী কবতে পারাই কৃতী শিল্পীর লক্ষণ—ইংরেজী পদ্ধতি থেকে এ প্রেরণা এসে থাকলেও কৃতিত্বের তাতে হানি হয় না।

এ ধরণের কবিতাগুলোর আবেগ প্রেমের আকাঙ্ক্ষা থেকেই জন্ম নিয়েছে—প্রেমের স্বাদগ্রহণ থেকে নয়। তাই তাতে স্বপ্নের স্পর্শই বেশি—একটি স্বপ্নের জগত তৈরী করতেও কবিকে তাই দেখা যায়ঃ

অনেক ধূসর স্মরণের ভারে এখানে জীবন ধূসরতম,
ঢালো উজ্জ্বল বিশাল বন্যা তীব্র তোমার কেশের তমো,
আদিম রাতের বেণীতে জড়ানো মরণের মতো এ আঁকাবাঁকা।
(ঝড় তুলে দাও, জাগাও হাওয়ার ভরা জোয়ার,
পৃথিবী ছাড়ায়ে, সময় মাড়ায়ে যাবো এবার,
তোমার চুলের ঝড়ের আমরা ঘোড়সওয়ার—
কঙ্কা, শঙ্কা কোরোনা) ('শেষের রাত্রি'—কঙ্কাবতী)

কিন্তু 'নতুন পাতা'য় প্রেমের স্বপ্ন আর নেই—চরিতার্থতায় প্রেম সেখানে স্বপ্নের কুয়াশা থেকে অনেকটা মুক্ত। চরিতার্থতার আনন্দ কবির মনে রূপান্তর এনে দিয়েছে—সমস্ত দেহ-কোষে এসেছে পরিবর্ত্তনঃ

নতুন হতেই হবে আমাকে,
আবার নতুন হয়ে উঠতেই হবে জীবনকে।
কী সেই নতুন ? সে তো তুমি,

তুমি, তুমি
আমার অতীতে তুমি ছিলে না,
তুমি ছিলেনা বছরের পর বছর জ'মে-ওঠা আকাঙ্ক্ষায় আর ব্যর্থতায়।
('ভবিষ্যৎ বাণী'—নতুন পাতা)

অথবা

নতুন সুর এসেছে জীবনে
রক্ত জ্বলছে আমার দু'হাতে, লাল আগুনের মতো
কেননা তুমি তাদের স্পর্শ করেছো।—('নতুন দিন'—ন, পা)

অথবা

আমি এতদিন ধ'রে ম'রে ছিলাম যে আজ
বড়ো আশ্চয্য মনে হচ্ছে প্রাণের এই নতুন জোয়ার।
জোয়ার ! জোয়ার !
উদ্দীপ্ত, উৎসুক বসন্তের মতো,
বসন্তের গাছের মধ্যে সবুজ, সতেজ প্রাণ রসের উৎসাহের মতো
জোয়ার ! জোয়ার !—('পুনরুজ্জীবন'—ন, পা)

এই পরিতৃপ্তি কবির চোখ থেকে স্বপ্নের রং মুছে দিয়েছে সত্য কিন্তু আবেগকে শান্ত-সমাহিত করে দিতে পারেনি। চাওয়ার উন্মাদনার চেয়ে পাওয়ার উন্মাদনা তাঁর মনে তিলমাত্র কম নয়। মনের যার প্রাচুর্য্য আছে ব্যবহারে প্রেম তার কাছে পুরোনো, বিস্বাদ হয়ে যায় না; আবিষ্কারের পথ তার কাছে রুদ্ধ নয়—নিজেরই সৃষ্টি-ক্ষমতায় সাধারণকে অসাধারণ করে তুল্‌তে পারে সে। বুদ্ধদেব বসুও তা পারেন, তিনি বল্‌তে পারেন: "তোমার একমাত্র গুণ এই যে তুমি মেয়ে"—(' যে কোনো মেয়ের প্রতি'—ন, পা)—আর তা নিয়েই তাঁর সৃষ্টির কাজ

চল্‌তে থাকে। যে আবিষ্কারক মন জনম অবধি রূপ দেখেও নয়নের তৃষ্ণা মিটাতে পারে না—বুদ্ধদেব বসু সে-মনেরই উত্তরাধিকারী। সে মন নিয়েই তিনি সাধারণকে অসাধারণ করে তুল্‌তে পারেন। সাধারণত্ব আর অসাধারণত্ব এ সব বিশেষণ ত বাইরের বিভূষণ, আমাদের অর্জ্জিত সম্পদ ; তাকে বাদ দিয়েও আমরা আছি—আমরা সবাই একই রকম রক্তমাংসের একই রকম আবেগ আর অনুভূতি নিয়ে আছি। জীবনের এ স্তরে প্রবেশ করেই লরেন্স তাঁর কবিতায় এমন একটা অনুভবের পরিচয় দিয়ে গেছেন যা প্রকৃতিরই মনের। তাই লরেন্স বলেছিলেন রক্তমাংসের স্পর্শের পরিচয়েই মানুষের সঙ্গে মানুষের নিবিড়তম পরিচয় হয়। বুদ্ধদেব বসুর দৃষ্টিতে আমরা ঠিক এম্নি একটি ভঙ্গী দেখতে পাই :

যদি আমাকে নিতেই হয়, তা হোক
শুধু আমারি জন্যে।
আমি।—যার কোনো নাম নেই, কোনো পরিচয, কোনো অভিজ্ঞান
যা দিয়ে লোক চিনতে পারে,
যার হৃৎমূলে দপদপ করে জ্বলছে রক্ত
যা দিয়ে তুমি আমাকে চিনবে।—('শেষ অঙ্গীকার'—ন, পা)

ফ্রয়েডীয় আবিষ্কারের ধারায় মানুষকে চিনতে গিয়ে লরেন্স যৌনতাকে যে পরিমাণে মহিমান্বিত করেছেন তা বিশ্ব সাহিত্যে দুর্লভ। অদ্ভুত তাঁর চেতনার অভিজ্ঞতা যা সাধারণের অনুভবের বাইরে। যদি কোনো আনন্দ থেকেই বিশ্বের জন্ম হয়ে থাকে, তবে তিনি সেই আনন্দকেই ভাষায় রূপায়িত করতে চেয়েছেন। বুদ্ধদেব বসুর 'জন্ম'

কবিতাটিও লরেন্সীয় চেতনার অদ্ভুত অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণ। যৌনতা এখানে কামাচারে আবদ্ধ নয়, মহিমায় উর্দ্ধগ।

'নতুন পাতা'য় যে কবি মনকেই নূতন করে সৃষ্টি করে নিয়েছেন তা নয়—বলার ভঙ্গীও তাঁর নূতন হয়ে উঠেছে এখানে। এ-বইএর সবগুলো কবিতাই গদ্যের ভঙ্গীতে লেখা। রবীন্দ্রনাথ যখন গদ্যকবিতার আন্দোলন এনেছিলেন, তখন থেকেই এ ধরণে কবিতা লিখতে সুরু করেন বুদ্ধদেব বসু। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতা থেকে বুদ্ধদেব বসুর গদ্যে লেখা কবিতার ভঙ্গী খানিকটা স্বতন্ত্র। গদ্যকবিতায় রবীন্দ্রনাথ ধ্বনির ছন্দ বর্জ্জন করলেও, ভাবেব বা আবেগের ছন্দ বর্জ্জন করেন নি, তাই তাঁর গদ্যছন্দে সাধাবণ কথা বলবার পদ্ধতিতে ভাষার ব্যবহার হয় নি। বুদ্ধদেব বসু এটুকু শৃঙ্খলাও মানতে চাননি—সাধারণ কথাবার্ত্তা বলবার ভাষা ব্যবহার করতে একটু তাঁর সঙ্কোচ নেই, অনায়াসে তিনি বলতে পেবেছেন: "আজকাল চাঁদ এতো দেরি করে ওঠে যে ঘুমোবার আগে আর তারে দেখতে পাইনে।" এই সহজ সরল উক্তিতে কোনো আবেগের দোলা হয়ত নেই আর তাই হয়ত একে আমরা কবিতা বলতে চাইব না; কিন্তু এ কথায় পেছনে দাঁড়িয়ে আছে যে-মন, তাকে কি আমরা কবিমন বলে স্বীকার না করে পারি? 'নতুন পাতা' বইটি সম্বন্ধেই এ কথা বলা যায়—কবিত্ব-গৌরবে বইটির কোনো বিশেষ কবিতাই হয়ত খুব উজ্জ্বল নয়, কিন্তু বইটি শেষ করে আমাদের বলতে হবে, এ রচনাগুলো যাঁর হাত থেকে বেরিয়েছে তিনি নিঃসন্দেহে কবি।

কবিতার আঙ্গিককে নূতন করে তোলার পেছনে আমরা কবির শিল্পীমনের পরিচয় পাই। কবিতা লেখা যে তাঁর প্যাশন—ফ্যাশন নয়, এ থেকে তা-ই প্রমাণিত হয়। মনে হয় কবিতা লেখার পেছনে যথেষ্ট আবেগ কাজ করে যাচ্ছে। প্রেম যেমন তার মনকে নূতন করে তুলেছে, কবিতাও তাঁর কবিমনে নূতন ঢেউ এনে দিয়েছে। 'নূতন পাতায়' তিনি কবিতা লেখার আবেগ সম্বন্ধে সচেতন—'বন্দীর বন্দনা'য় যেমন কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন ঃ

> আমার আকাশে বাতাসে আশে-পাশে দীর্ঘশ্বাসে, আমার চাওয়ায়
> ছোঁওয়ায় আসবি কলোচ্ছ্বাসে উর্দ্ধশ্বাসে, আমার ব্যথায় হতাশায়
> হানবি বিদ্যুৎ ভাঙবি আমার বুক। ওরে কথা ওরে কবিতা ওরে
> অজস্র অবাধ্য অধুরন্ত দুরন্ত কলরোল।—('নিজের কবিতার প্রতি'—ন, পা)

তাঁর কবিতার উৎস-মূলে যে প্রেম সে কথাও তিনি আবার এখানে স্মরণ করেছেন ঃ

> একদিন আমার সমস্ত মন পূর্ণিমার সমুদ্রের মতো
> উদ্বেল হয়ে লুটিয়ে পড়েছিলো যার পায়ে।
> একদিন আমার রক্তের ঢেউ থেকে যে উঠে এসেছিলো শুভ্র আফ্রোদিতের মতো।
> তাকে দেখে মন্ত্রের মতো ধ্বনিময় হয়ে উঠেছিলো আমার কথা,
> সেই তো কবিতা।—('নতুন পাতা'—ন, পা)

'নতুন পাতা'র পাঠকদের মনে এ কথা বারবারই মনে হতে পারে যে কবির কাছে সংযমের দাম কতটুকু। সংযম বলতে বাক্‌সংযমই অবিশ্যি এখানে বোঝায়। কবিতায় যদি সংযমের কোনো ঠাঁই থেকে থাকে তাহলে বলতে হয় বুদ্ধদেব বসুর কবিতা অসংযমের

দোষে দোষী। পাঠকের মনে অনুভূতি সঞ্চার করে দেবার যে দায় কবিতার আছে তাকে বুদ্ধদেব বসু মান্‌তে চাননা—তাঁর আর্ট সম্পূর্ণ নিজের জন্যে, নিজেকে প্রকাশ করবার জন্যেই তাঁর কবিতা। কাজেই নিজেকে প্রকাশ করতে হলে বাক্‌বাহুল্য যদি এসেই যায় তাহলে কি ক্ষতি? এধরণের অ্যাটিট্যুডের উপর কটাক্ষ না করেও বলা যায় যে কম কথায় নিজেকে প্রকাশ করতে পারাও কম কথা নয়। বেশি কথা বলার অনেক দোষের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য দোষ এই যে কথার স্তূপ তৈরী করতে অনেক সময় বিপরীতার্থক কথাও ব্যবহৃত হতে থাকে। যেমন: একটি কবিতার পংক্তিতে বুদ্ধদেব বসু বলছেন: "জীবনে এমন কঠিন কোনো দাম নেই যা আমি তোমার জন্যে দেবনা।"—এই প্রতিশ্রুতি দেবার কয়েকটি পংক্তি পরেই আবার বলছেন: "যে-পৃথিবীকে ঘৃণা করি তোমার জন্যেও তাকে সম্মান করতে পারব না।"

বুদ্ধদেব বসুর যৌবনোত্তর কবি-মানসের ছবি পাওয়া যায় তাঁর 'দময়ন্তী' কাব্য-গ্রন্থে। অতীত যৌবনের উত্তরাধিকার নিয়েই নূতন যৌবনের আবির্ভাব হয়—কিন্তু কবি আর এখানে যৌবনোদ্বেল, উদ্ধত মন নিয়ে নূতন যৌবনকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছেন না। তাঁর দৃষ্টি এখন শান্ত, বিনীত। কন্যার যৌবনের কথা ভেবে তাঁর মনে হয় যে যৌবন এর দেহের কাছেও স্বর্গের দাবী এনে উপস্থিত করবে, যেমন যুবতী দময়ন্তীর পাণিপ্রার্থী হয়ে তাঁর স্বয়ম্বর সভায় স্বর্গের দেবতারা উপস্থিত হয়েছিলেন। যৌবনকে স্বর্গের আবির্ভাবে ধন্য মনে করা কবির পক্ষে নূতন নয়—'বন্দীর বন্দনা'য় যৌবনের

স্পর্শে নিজেকে তিনি 'শাপভ্রষ্ট দেবশিশু' বলেই বিশ্বাস করেছেন। সেই শাপভ্রষ্ট দেবশিশু পৃথিবীর জৈব প্রণয়ের দাবী মিটিয়ে শান্ত নিরুদ্বেল জীবনে—'স্বগৃহে স্বরাজ্যে, শান্তির কঠিনতীরে পুনর্জিত স্বর্গের দুয়ারে'—ফিরে যায়। এই জৈব প্রণয়ের দাবী কবির কন্যাকেও পূরণ করতে হবে, দময়ন্তীর মতো সে-ও ফিরিয়ে দেবে দেবতাদের, নলের আকর্ষণই তার কাছে বড় হয়ে উঠবে। 'যৌবনের জাদু স্বর্গ রচে জন্তুর গুহায়'—তবু 'বিবসন, বিশুদ্ধ, জান্তব' প্রণয়কেই সে বরণ করবে—এ তার অতীতের উত্তরাধিকার।

কিন্তু যৌবনের সবকিছুকেই যৌবনোত্তর মনে সত্য আর ভালো বলে মনে হচ্ছে না কবির। আত্মকেন্দ্রিক যৌবন জীবনকে নিজ স্বার্থের রঙে রঙীন করে দেখতে চায়ঃ

> মনে করে সূর্য্য তারই সম্ভোগের পথের প্রদীপ
> তারার সেনানী তারই রতি-হ্রস্ব রাত্রির পাহারা।
> উদ্ধত সে,
> সামান্য সংকল্প নষ্ট হলে অদৃষ্টের দোষে
> বিশ্বে নিন্দে..... ('দময়ন্তী'—দময়ন্তী)

যৌবনোত্তর দিনের স্থির, নিশ্চিন্ত সত্তা দিয়ে এখন তিনি উপলব্ধি করছেনঃ

> বিনষ্ট সঙ্কল্প পূর্ণ, সার্থক ধিক্কৃত অনটন
> স্বার্থ-কেন্দ্র-চ্যুত বিশ্ব ফিরিছে আদিম মহিমায়। ('দময়ন্তী'—দ)

এ উপলব্ধি যৌবনে আসেনা; আত্মকেন্দ্রিক ইচ্ছা দিয়ে যৌবন প্রকৃতিকে সাজিয়ে তুলতে চায়, বাজিয়ে তুলতে চায়; এমনকি প্রেমের হাতেও ইচ্ছার শৃঙ্খল জড়িয়ে দেয়। কবি কামনা করছেন

এই ইচ্ছার উচ্ছলতা শেষ হোক—পৃথিবী যেন মানুষের ইচ্ছার চক্রে আবর্ত্তিত না হয়। ইচ্ছার, আবেগের ও সম্ভোগের কবির মুখে শ্মশান-বৈরাগ্যের মতো শোনা যায় :

.....আমার প্রেমেরে
প্রেমেরেও মুক্তি দাও ইচ্ছার শৃঙ্খল থেকে। ('দময়ন্তী'—দ)

কবির সম্ভোগ-কামনা শান্ত, বিনীত হয়ে এসেছে সত্য কিন্তু সৃষ্টি-কামনা তাঁর নষ্ট হয়ে যায় নি। 'বন্দীর বন্দনার' 'কালস্রোত' কবিতায় কালকে তিনি যৌবন ধ্বংসী শক্তি হিসাবেই গণ্য করে ভীত হয়েছেন কিন্তু এখন কালের স্পর্শ তাঁর কাছে কেবল মৃত্যু-শীতলই নয়, সৃষ্টির কারুশিল্পী হিসেবেও কালকে তিনি আবিষ্কার করতে পেরেছেন :

হে কাল হে মহাকাল, তোমারি তো
তোমারি তো আমাদের হৃদয়ের উল্লসিত
সৃষ্টির উৎসাহ, আমাদের শরীরের
বসন্ত-বাসনা··· ····· ('হে কাল'—দ)

এই সৃষ্টির উৎসাহ জীবনেরই ধর্ম্ম ; সৃষ্টির হাত থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারে না জীবন—যতো বার্দ্ধক্যই তাতে আসুক, যত পুরোনোই সে হোক। এ উপলব্ধি প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় আগেই আমরা পেয়েছি : "তবু আজো পুরাতন বীজ পৃথিবীতে মেলিছে অঙ্কুর····· কোথায় ছাড়ায়ে যাবে এ সৃষ্টিরে ?" যৌবনের প্রান্তে এসে বুদ্ধদেব বসু অনুরূপ উপলব্ধিই করছেন :

এই পৃথিবীর
পুরোনো শরীরে আসে বসন্তের দস্যুতার ভিড় ;

কোনো নিদ্রাহীন রাতে
আমারও শরীর যেন মুঞ্জরিত হতে চায়
আকাশে জ্যোৎস্নাতে। ('হে কাল'—দ)

কবি সৃষ্টির আকুলতা অনুভব করেন সন্দেহ নেই—কিন্তু সত্যি কোনো বিস্ময়কর সৃষ্টি দিয়ে তিনি কি পাঠকদের আকুল করে তুলতে পেরেছেন? কর্ম্মব্যস্ত জীবনের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করে ছোট ছোট 'বিচিত্রিত মুহূর্ত্ত' ভুঞ্জনেই তাঁর দিন কেটে যাচ্ছে। যে উজ্জ্বল মন বিবর্ণ হয়ে গেছে, এ যেন স্মৃতির মতো তাকে নিয়েই বসবাস করা। মনে একটু ছন্দের স্পর্শ পাওয়া, বসন্তের হাওয়ায় একটু বৈকালিক ভ্রমণের ইচ্ছা, কলকাতার জীবনে হঠাৎ একটা জোনাকিকে দেখে আরাম বোধ, ছোট ঘরে বসে প্রেমকে স্মরণ করে কিম্বা ছোট ছোট হাসি দিয়ে জীবনকে তৃপ্ত রাখার নাম নিশ্চয়ই সৃষ্টি নয়। এ ত সেই ইচ্ছারই প্রকোপ যে ইচ্ছার তিনি ধ্বংস কামনা করেন! এ তাঁর পুরোনো মনেরই প্রেত যাকে আশ্রয় করলে শিল্পীর মৃত্যু অবধারিত।

কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর সৃষ্টি-ক্ষমতার নিঃশেষ মৃত্যু হয়নি। আমরা দেখতে পাই কোনো এক সময়ে নিজেকে ছাড়িয়ে তাঁর দৃষ্টি বাইরের দিকে বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। আর সে-দৃষ্টি নিয়ে তিনি 'ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা'র মতো একটি সার্থক কবিতাও সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। আফ্রিকার ছায়াচ্ছন্নতায় কবির কল্পনা এখানে পক্ষবিস্তার করবার সুযোগ পায়নি—কবি লক্ষ্য করেছেন আফ্রিকার বাস্তব জীবনের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে; আফ্রিকার উপর তাঁর শুভ ইচ্ছা মন্ত্রের ধ্বনির মতোই কবিতা সৃষ্টি করেছে:

হে আফ্রিকা, হে গণিকা মহাদেশ
একদিন তব দীর্ণ বিষুবরেখার
শতাব্দীর পুঞ্জ-পুঞ্জ অন্ধকার
উদ্দীপিত হবে তীব্র প্রসব ব্যথায়।
করো,
মৃত্যুরে মন্থন করি নবজন্ম কাঁপে থরো থরো
জয়ধ্বনি করো।

এই নূতন দৃষ্টি নিয়ে লেখা আর কোনো কবিতায়ই তিনি এতটা সার্থক হয়ে উঠতে পারেননি। আরো দু'একটি রচনায় তিনি নূতন দৃষ্টি লাভ করেছেন—কিন্তু তা কবিতা হয়নি ; যেখানে বা কবিতা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের স্পর্শ বাঁচিয়ে তিনি সরে দাঁড়াতে পারেন নি। 'পূর্ব্বরাগ' পড়তে পড়তে অনেকবারই রবীন্দ্রনাথকে আমাদের স্মরণ করতে হয়। 'কবিজীবনী' পড়ে রবীন্দ্রনাথকে খানিকটা স্মরণ করেও কবিতাকে আমরা স্মরণ করতে পারিনে ঃ

হাঁটু জলে মাঠে যারা কাটায় আষাঢ়, যারা নামে
খনির তিমিরে, করাল রৌদ্রের দিনে রাজপথে
হাঁটু ভেঙ্গে খাটে যারা, মৃত্তিকার, খনির, যন্ত্রের
ঐশ্বর্য তাদেরই। তাদেরই তা হোক। আনন্দের
উৎস হোক সকলেরই স্বীয় শ্রম—কৃষকের, যন্ত্রীর, কবির।

এ-পংক্তিগুলো একটা অতি বড় সত্য উদ্ঘাটন করছে ঃ কবিতায় বুদ্ধদেব বসুর তখনই ঔৎকর্ষ দেখা যায় যখন তার বিষয় থাকে প্রেম। নিজস্ব আবেগের যতো সার্থক ব্যঞ্জনা তিনি দিতে পারেন তার সিকি পরিমাণও সমাজ বর্ণনায় এসে উঁকি দিয়ে যায় না। ভাষার খরধারে

বিদ্রূপাত্মক কবিতায়ও তিনি অনেকটা সফল—কিন্তু তাঁর যে-সব রচনা সমাজের প্রতি শুভ ইচ্ছা বহন করে, কবিতার প্রাণ (বা আবেগ) সেখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

'দময়ন্তী'র অনেকগুলো কবিতার ভাষা ও ছন্দে দেখা যায় যে বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়ে এসে উপস্থিত হয়েছেন। মনও তাঁর রবীন্দ্রনাথ থেকে অভিন্ন হয়ে উঠছে। রবীন্দ্রনাথ থেকে অর্জ্জন করে বাংলা কবিতাব অগ্রগতি হবে এ কথা অবিসংবাদী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন কবে থাকলে কবিতা এগুতে পারবে কি না সন্দেহ। আমাদের সন্দেহ হয়, রবীন্দ্রনাথের মনকে বুদ্ধদেব বসু অবলম্বন করে নিয়েছেন—যা 'বন্দীব বন্দনা' 'কঙ্কাবতী' আর 'নতুন পাতা'র কবির পক্ষে হয়ত শুভলক্ষণ নয়।